এক অধ্যায়

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী
কানাই পাল

তিন টাকা

নিবেদন

প্রায় দু'বছর আগে যখন আমি সরকারী চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি তখন ভাবিনি' যে আমার আই-সি-এস্ জীবনের শেষ বছরের কাহিনী সম্বন্ধে এত শীগ্‌গীর কিছু লিখব। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে এত অনুরোধ উপরোধ আস্‌তে সুরু কর্‌ল যে অবশেষে কলম ধরতে বাধ্য হ'লাম।

এই স্মৃতিকাহিনীতে অনেক খণ্ডদৃশ্যের (episode) অবতারণা কর্‌তে হয়েছে। কাহিনী বল্‌তে গেলেই পাত্র-পাত্রীদের একটা নাম দিতে হয়, আমাকেও দিতে হয়েছে। কিন্তু সব নামই কাল্পনিক। আমার অজান্‌তে এসব নামে কোন লোক যদি থেকে থাকেন তাঁদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি।

এই অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে নিজেকে আমি মঞ্চের পুরোভাগে নিয়ে আস্‌তে বাধ্য হয়েছি। এটা না কর্‌লে কাহিনী অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন হয়ে থাক্‌ত। আমার এই অনিচ্ছাকৃত অহমিকা বা অস্মিতাকে পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমার চোখে দেখলে অনুগৃহীত বোধ কর্‌ব

বোম্বাই,
আশ্বিন, ১৩৬৭ সাল

শ্রীনবগোপাল দাস

এই লেখকেরই

❋ উপন্যাস ❋

অভিযাত্রী	৫'০০
সাগর দোলার ঢেউ (২য় মুদ্রণ)	৩'০০
অনবগুণ্ঠিতা (২য় মুদ্রণ)	৩'০০
নিঃসহ যৌবন (২য় মুদ্রণ)	৪'৫০

❋ ছোট গল্প ❋

তারা দু'জন (২য় মুদ্রণ)	২'৫০
অসমাপ্ত (২য় মুদ্রণ)	২'৫০
শূন্য কুম্ভ (যন্ত্রস্থ)	

অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, যে এক বছর আমি পশ্চিমবাংলা সরকারের দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম সে সময়কার অভিজ্ঞতার বিবরণী যদি লিপিবদ্ধ করি তাহ'লে হয়ত দেশের কল্যাণ হ'তে পারে। আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের এই অনুরোধ পুরোপুরি রক্ষা করতে আমি অক্ষম, বিশেষ ক'রে specific কেস্-এর কথা বলবার অনুরোধ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে যাঁদের সম্বন্ধে তাঁরা জানতে চান তাঁদের অনেকেই এখনও সরকারী দপ্তরে বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের বিড়ম্বিত করা অভদ্রোচিত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, আমি পলিটিশিয়ান নই, আমার অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত ক'রে পলিটিক্স-এর সৃষ্টি হয়, এ আমি চাই না।

তবে আমার ছাব্বিশ বছরের চাকুরী জীবনে (আই-সি-এস-এর প্রোবেশনারি সময়টা লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সএ কাটিয়ে আমি দেশে ফিরি ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং রাজসাহী জেলায় এসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে যোগদান করি। আই-সি-এস থেকে পদত্যাগ করি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে—যদি চাইতাম, আরও নয় বছর আমি এই সার্ভিসে কাজ করতে পারতাম।) দুর্নীতি-দমন বিভাগের এই সচিবত্ব একটা বড় অধ্যায় বই কি! এই এক বছরে আমি যা দেখেছি এবং শিখেছি তার তুলনা হয় না। আমার এই কাজ উপলক্ষে আমাকে কত বিচিত্র সংস্থার সম্মুখীন যে হ'তে হয়েছে তা' বল্‌তে পারি না। সরকারী এবং বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ খবর আমার নজরে এসেছে এবং এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নিয়তির পরিহাসে (অথবা

আমারই ইচ্ছায়) এই অধ্যায় আমার আই-সি-এস জীবনের শেষ অধ্যায়ও বটে।

আগেই বলেছি, কোন কেস্-এর বিবরণী আমি লিখব না। তবে এই এক বছরে আমি যে কত অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তার দু'একটা কাহিনী বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাকে হয়ত আনন্দ দিতে পারে। সেই জাতীয় কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাই বল্‌ব।

এই প্রসঙ্গে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার। কাহিনী বল্‌তে গেলে পাত্র-পাত্রীদের একটা নাম দিতে হয়, আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু সব নামই কাল্পনিক, অর্থাৎ কেউ যেন ভুলেও মনে না করেন যে যথার্থ ই একজন অমিতাভ গোস্বামী বা শ্রীমতী কাকলি দেবী আছেন বা ছিলেন। আমার অজান্‌তে এই সব নামে কোন লোক যদি থেকে থাকেন তাঁদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি এবং আবার বল্‌ছি তাঁদের বিব্রত করা আমার কল্পনারও বাইরে।

প্রথমেই বলা দরকার, আমি দুর্নীতি দমন বিভাগের ভার নেই ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে। তার ঠিক আগে প্রায় বৎসরাধিককাল আমি ছিলাম সেচ ও জল বিভাগের সচিব।

দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার আমি খুসী মনে নেইনি। সেচ ও জল-বিভাগের সমস্যাগুলোর সঙ্গে আমি সবেমাত্র পরিচিত হ'তে আরম্ভ করেছি, এত শীঘ্র বিভাগীয় পরিবর্তন আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু রাষ্ট্রের বৃহত্তর দাবীর কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না, কাজেই মন থেকে সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলেও কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে নিয়েছিলাম।

নতুন বিভাগের ভার নেবার ফলে আমাকে চলে যেতে হ'ল রাইটার্স বিল্ডিংএর শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরা থেকে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটএর দোতলায় সাধারণ এক কামরায়। সত্যি কথা বলতে কি,

এই পরিবর্তনটা আমার ভাল লাগেনি। নতুন কামরায় air-conditioning-এর অভাবের কথা বল্‌ছি না, আমার ভাল লাগেনি' এই জন্য যে মন্ত্রীপর্ষদ, মুখ্যসচিব এবং অন্যান্য সচিবদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হ'লাম। অবশ্য কাজ উপলক্ষে আমাকে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'তিনবার রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ যেতে হ'ত, কিন্তু সে হচ্ছে অতিথির পোষাকে, অন্যতম ভাড়াটে হিসেবে নয়।

সে যাই হোক, নতুন কামরায় এসে বস্‌লাম এবং যথারীতি নতুন দপ্তরের প্রধান প্রধান অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর দেখলাম কাজের তালিকা। আমার অফিসারদের জানিয়ে দিলাম আমার কর্মপদ্ধতি। শুনেছিলাম, দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের দিনে দু'তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করার প্রয়োজন হয় না। আমি বল্‌লাম যে পূর্বতন ইতিহাসে যাই লেখা থাকুক না কেন, আমি অফিসে থাকব দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি এবং নিজে গ্রহণ কর্‌ব প্রত্যেকটি তদন্তের একটা মোটা অংশ।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করা আমি চিরকাল পছন্দ করে এসেছি। আমি দেখেছি, এ ভাবে অনেক বেশী কাজ করা যায়। সুদীর্ঘ টিফিনে বা মুখরোচক গল্প-গুজবে সময় কাটানো আমার কোনদিনই ভাল লাগত না, কাজ শেষ করে গল্প, এই ছিল আমার রীতি। উর্ধ্বতন মহলে আমার দুর্নাম ছিল যে আমি নাকি ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার পর অফিসে এক মুহূর্তও বসে থাকতাম না। অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা নয়, অথচ আমার অতি বড় শত্রুও এই অপবাদ কখনও দিতে পারেনি যে আমার টেবিলে কোন ফাইল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

মোট কথা, আমার ভাব-ভঙ্গী দেখে আমার নতুন দপ্তরের অফিসাররা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে গতানুগতিক পথে আমি চল্‌ব না।

দুই

নতুন দপ্তরের ভার নিয়েই আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তা দূর কর্‌বার জন্যই এই দুর্নীতিদমন বিভাগ স্থাপিত হয়েছে, জনসাধারণ আশা করে খানিকটা অন্তত দুর্নীতি আমরা দূর করতে পারব। অতএব নির্ভয়ে আমরা কাজ কর্‌ব এবং আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী যাদের লোভ এবং অর্থ-পিপাসার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই, যাদের ব্যবহারে অধস্তন কর্মচারীরা হয়ে উঠেছে ভীত, সন্ত্রস্ত এবং বাধ্য হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ।

আরও জানিয়ে দিলাম যে, যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমি দেখা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। এক সর্তেঃ যদি দর্শনপ্রার্থী দুর্নীতির কোন বিশদ্ খবর দিতে পারেন। অমুক দপ্তরে দুর্নীতি চল্‌ছে বা অমুক অফিসার দুর্নীতিপরায়ণ বা দুর্নীতির পোষক, এই জাতীয় খবরের বদলে আমি জানতে চাই, ঠিক কি ভাবে দুর্নীতি চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও আমি দিলাম যে সংবাদবাহকের নাম-ধাম আর কেউ জানবেন না—একমাত্র আমি এবং আমারই খুব বিশ্বস্ত দু'একজন অফিসার ছাড়া।

আমার এক সতীর্থ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ডাঃ দাস, এটা কি সঙ্গত হ'ল? এতে ত গুপ্তচরেরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে, তারা নানা মিথ্যা অভিযোগ আপনার কাছে নিয়ে আসবে, যার ফলে অনেক নির্দোষ ব্যক্তিকেও আপনি বা আপনার অফিসারেরা হয়রান করবেন।

এই সম্ভাবনা যে ছিল এবং এখনও আছে, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু দুর্নীতি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি? যারা

দুর্নীতিপরায়ণ বা দুর্নীতির পোষক তাদের অনেকেই হয় উচ্চপদে আসীন, নতুবা লক্ষ বা ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। মুখোমুখি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত দুঃসাহস ক'জন লোকের আছে বা থাক্‌তে পারে? যদি তারা খোলাখুলিভাবে অভিযোগ করে তাহ'লে যারা অভিযুক্ত তারা কি আপ্রাণ চেষ্টা করবে না অভিযোগকারীদের নানাভাবে বিব্রত এবং ব্যাহত করতে?

আমার সতীর্থকে আমি বলেছিলাম, পঁচিশ বছর চাকুরী করে যদি আমার এটুকু অভিজ্ঞতাও না হয়ে থাকে যে অভিযোগকারীদের অভিযোগের মধ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু নির্জলা মিথ্যা, তাহ'লে বৃথাই আমি চাকুরী করেছি।

আজ আমি বলতে পারি যে আমার এই কর্মপদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। অনেক জিনিসই আমার এবং সরকারের অজ্ঞাত থেকে যেত, যদি আমি এইভাবে অভিযোগ আমন্ত্রণ না করতাম।

তবে এর হাস্যকর দিকও আছে। দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

অফিসে বসে ফাইল ঘাঁটছি, চাপরাশী এসে স্লিপ দিল—অপরিচিত নাম। নামের নীচে লিখেছেন: "অত্যন্ত জরুরী, sensational খবর আছে।"

আমি জানি যাঁরা আগে থেকে বলেন, sensational খবর আছে, তাঁদের অধিকাংশ খবরই হয়ে থাকে অতি সাধারণ অথবা নৈর্ব্যক্তিক। তবু ভাবলাম, দেখাই যাক্ না ভদ্রলোকটি কে এবং কি বল্‌তে চান।

চাপরাশীকে বললাম, আসতে বলো।

ভেতরে ঢুকলেন জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর পরিধেয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিল না, গেরুয়া রং-এর পোষাকে বরং মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র কোন বাংলা ফিল্‌ম্‌এর সেটএ অভিনয় করে আমার কাছে এসেছেন।

বসতে বল্‌লাম, তারপর শ্লিপএর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার নাম লিখেছেন—অমিতাভ গোস্বামী, কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে নামের সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিনা !

হেসে বল্‌লেন, কেন, আপনি কি আশা করেছিলেন অমিতাভানন্দ হ'লে বেশী মানাত ?

খানিকটা হয়ত তাই, কিন্তু কিছু বল্‌লাম না আমি।

অমিতাভ গোস্বামী বলে চললেন, আমি এসব "আনন্দ" "টানন্দ"য় বিশ্বাস করি না। আমি যা তা'ই। তাছাড়া আমাদের সাধুসমাজেও নতুন কিছু আনতে হবে ত, আমরাই বা কেন চিরকাল গতানুগতিক রীতি অনুসরণ ক'রে চল্‌ব ? তাই আমি আমার পিতৃদত্ত নাম বদ্‌লাইনি।

মনে মনে বল্‌লাম, শুনে সুখী হ'লাম।

মুখে বল্‌লাম, কি খবর আপনি এনেছেন, বলুন।

প্রশ্ন কর্‌লেন, বল্‌লে action নেবেন ত ?

—যদি মনে করি action নেওয়া দরকার, নিশ্চয়ই নেব।

—ঐ আপনাদের বাঁধা গত !...অসহিষ্ণুভাবে গোস্বামী মশায় বল্‌লেন।...যদি মনে করি action নেওয়া দরকার, নিশ্চয়ই নেব ! আপনাদের এই মনোবৃত্তির ফলেই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

তিরস্কারটা নীরবে হজম কর্‌লাম। বল্‌লাম, দেখুন, অনেক কাজের চাপ পড়েছে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন কি বলতে চান্ আপনি।

—বল্‌ব ? বল্‌ব ?...এদিক ওদিক তাকালেন তিনি।

আমি বল্‌লাম, কোন ভয় নেই, আর কেউ শুন্‌ছে না।

স্বরটা একটু নীচু খাদে নিয়ে এসে বল্‌লেন, জানেন আপনাদের সরকারের একজন বড় কর্মচারী স্বামী—নন্দের শিষ্য ? শুধু তিনি কেন, তাঁর দপ্তরের অনেক কর্মচারীও। অথচ স্বামী—নন্দ হচ্ছেন জোচ্চোর বাট্‌পাড় লম্পট। আপনি এর একটা বিহিত করতে পারেন না ?

—আপনি যে খবরটা দিলেন তা' আমি অনেক আগে থেকেই জানি। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা আমাদের কাজ নয়।

—আপনাদের কাজ নয়?...তীব্রভাবে মন্তব্য কর্‌লেন গোস্বামী মশায়।...তাহ'লে কাজটি বুঝি আমার?

বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু কথায় কথা বাড়্‌বে, তাই থেমে গেলাম।

শুধু বল্‌লাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, গোস্বামী মশাই। এর চেয়ে জরুরী অনেক কাজ আমাদের রয়েছে, সেগুলো যদি শেষ করে উঠতে পারি তখন না হয় আপনার অভিযোগটা তদন্ত কর্‌ব।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে পড়্‌লেন তিনি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন কর্‌লেন, আপনিও বুঝি—নন্দের শিষ্য?

আমি হেসে জবাব দিলাম, না। সে সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া, কোন—নন্দেই আমার বিশ্বাস নেই।

তিন

দ্বিতীয় ঘটনার নায়ক (অথবা নায়িকা) হচ্ছেন একজন মহিলা।

সেদিন অফিসে পৌঁছুতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতেই চাপরাশী বল্‌ল যে একজন "মেমসাহেব" প্রায় আধঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করছেন। প্রথমে আমার ঘরেই বস্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে অফিসে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছে।

বল্‌লাম, ডাকো।

মিনিট পাঁচেক পরে পর্দাটা তুলে ঘরে ঢুক্‌লেন মধ্যবয়সী একজন মহিলা। গায়ের রং ময়লা, গড়ন স্থূলতার দিকে, তবু যৌবনকে আঁক্‌ড়ে ধরে রাখবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

আমার নির্দেশমত একটা চেয়ার টেনে তিনি বস্‌লেন। জিজ্ঞাসু-ভাবে তাকালাম তাঁর দিকে।

—শুনেছি আপনি নাকি দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আপনার কথায় ওঠেন বসেন।

আমি বিনীতভাবে জানালাম যে প্রথমটা সত্যি হলেও দ্বিতীয়টা তাঁর ভ্রান্ত ধারণা। যতদূর জানি, মুখ্যমন্ত্রী কারও কথায়ই ওঠেন বসেন না এবং আমার কথায় যে নয় তা' হলপ ক'রে বল্‌তে পারি।

ভদ্রমহিলা বোধহয় বিশ্বাস কর্‌লেন না। বল্‌লেন, স্বীকার কর্‌তে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সে যাই হোক্‌, আমার পরিচয়টা আগে দেই। আমি হচ্ছি শ্রী—ঘোষালের স্ত্রী। আমার স্বামীর নাম শুনেছেন বোধ হয়, তিনি—দপ্তরে কাজ করেন।

নাম শুনেছি বই কি! কিন্তু যতদূর জানি, আমাদের বিভাগের খাতায় ত তাঁর নাম উল্লেখ নেই। তবে? অবশেষে স্ত্রী এসেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্‌তে? আমার এই অবাধ আমন্ত্রণ দেখ্‌ছি নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে।

কিন্তু এখন ত পশ্চাদ্‌পদ হলে চল্‌বে না। তাই চুপ করে রইলাম।

শ্রীমতী ঘোষাল বল্‌লেন, আমার স্বামীর দপ্তরে একজন মেয়ে এসিস্ট্যান্ট আছে, কাঁচা বয়স—, নাম—কুমারী—চক্রবর্তী।

ওঃ হরি, এ যে রীতিমত নারীসুলভ ঈর্ষা! তবে কি শ্রীযুত ঘোষাল এই মেয়ে এসিস্ট্যান্টকে নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌ছেন? যদিও মেয়ে পুরুষের দৈহিক বা মানসিক সম্পর্কের নৈতিকতা প্রত্যক্ষভাবে আমার দপ্তরের আওতায় আসে না, তবু পরোক্ষভাবে আস্‌তে পারে—যদি তার ফলে দুর্নীতির সৃষ্টি হয় অথবা দপ্তরের শালীনতা বা শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

শ্রীমতী ঘোষাল বলে চল্‌লেন, না, আমার স্বামীর কোন দুর্বলতা নেই। যদি থাক্‌ত তাহ'লেও নালিশ নিয়ে আপনার

দপ্তরে আস্‌তাম না, কারণ এসব বিষয় নিজেই handle কর্‌বার মত প্রত্যয় আমার আছে।

তবে ?

—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে মেয়েটা ওরই সতীর্থ এসিস্ট্যাণ্ট শ্রী—মজুমদারের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। শুন্‌ছি ও নাকি শীগ্‌গীরই মজুমদারকে বিয়ে করবে। আপনাকে এর একটা বিহিত কর্‌তেই হ'বে!

আমি সত্যি হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, আমি ? আমি কি কর্‌তে পারি ?

—কেন ? আপনি ত দুর্নীতি দমনের কর্ত্তা। আপনার নাম বাংলাদেশের কে না জানে ? আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছি সমাজের বুকে যে দুর্নীতি চল্‌ছে তা' আপনি দূর কর্‌বেন এই ভরসায়।

শ্রীমতী ঘোষালকে বিনীতভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, এই জাতীয় দুর্নীতি দূর করা আমার কর্তব্যের তালিকার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া সমাজের নানাস্তরে যে সব অন্যায় লুকানো রয়েছে তা' কোন সরকারী দপ্তরের পক্ষেই দূর করা সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে কুমারী চক্রবর্তী ও শ্রীযুত মজুমদারের যে সম্প্রীতির কথা তিনি বল্‌লেন, তা' দুর্নীতির পর্যায়ে আদৌ পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।

ঠিক কি বলেছিলাম এখন মনে পড়ছে না, তবে যা বলেছিলাম তার সারার্থ টুকু আপনাদের জানালাম।

শ্রীমতী ঘোষালের ব্যবহার কিন্তু আমার কাছে প্রহেলিকাময় বলে মনে হচ্ছিল। প্রশ্ন কর্‌লাম, কিন্তু আপনি এই অভিযোগ নিয়ে এলেন কেন ?

—আমি এলাম কেন ? মজুমদার ছেলেটি বড্ড ভাল, ঐ হতচ্ছাড়া মেয়েটা যদি ওকে বশ না কর্‌ত তা'হলে আমার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতাম।...ওঁকে কতবার বলেছি, কুমারী

চক্রবর্তীকে অন্য কোথাও বদ্‌লী করে দাও, কিছুতেই আমার কথা শুন্‌বেন না! বলেন কিনা, আমি নাকি ওঁর সরকারী কাজে interfere কর্‌ছি! আচ্ছা, আপনি ত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনিই বলুন, দপ্তরের মধ্যে এ জাতীয় বেলেল্লাপনার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম শ্রীমতী ঘোষালের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। তাই বল্‌লাম, আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসুন।…নমস্কার।

চার

আমি যে একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী এটা দুর্নীতিদমন বিভাগে এসে যত শুনেছি তার আগে কোথাও এতটা শুনিনি'! যে কেউ কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছেন তিনি মুখবন্ধ বা সমাপ্তি করেছেন এই জাতীয় স্তুতিবচনে। প্রশংসা এবং গুণগান শুন্‌লে স্বয়ং মহাদেবও (সরকারে যাঁরা সর্বোচ্চপদে আসীন তাঁরা হচ্ছেন কলিযুগের মহাদেব) গলে যান্, আমি ত নগণ্য রাজকর্মচারী মাত্র! তবু এত বেশী স্তুতিবাক্য শুনেছিলাম বলেই বোধ হয় আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ত যিনি এসব বল্‌ছেন তাঁর বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—take it with a grain of salt; আমিও অভিযোগ শুন্‌তাম একটুখানি লবণ মিশিয়ে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে আমার অনেক সতীর্থ এটা বিশ্বাস কর্‌তেন না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল (এখনও বোধ হয় আছে) যে আমি উদগ্র হয়ে শুনি যত সব আজগুবি, অবান্তর কাহিনী, বিশ্বাস করি তার শতকরা নিরানব্ব্‌ই ভাগ এবং তদন্ত কর্‌বার আগেই অভিযুক্তকে মনে মনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখি।

এই ধারণা যে কত মিথ্যা তা' জানেন তাঁরা—যাঁরা আমার সঙ্গে দুর্নীতিদমন দপ্তরে কাজ করেছেন। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা উচিত

হবে না, তবে এটুকু বলতে পারি যে বেশ কয়েকজন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন অভিযোগ আমি পেয়েছিলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার পর যখন আমি দেখ্‌তে পেলাম যে অভিযোগগুলি প্রতিহিংসামূলক বা ঈর্ষাপ্রসূত, তখন clearance সার্টিফিকেট দিতে আমি এতটুকু ইতস্তত করিনি'।

আমার দেওয়া clearance সার্টিফিকেট-এর দাম যে কতখানি তা' বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন, যেদিন একজন মধ্যপদস্থ কর্মচারী এসে আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, ডাঃ দাস। রিপোর্ট না যাওয়া পর্যন্ত মন্ত্রী থেকে ডেপুটি সেক্রেটারী পর্যন্ত আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। আপনার রিপোর্ট পেয়েই সেক্রেটারী আমাকে ডেকে বলেছেন, ডাঃ দাস যখন অভিযোগগুলো মিথ্যা এবং অবিশ্বাস্য বলেছেন তখন আপনি নির্ভয়ে কাজ করে যেতে পারেন। ওঁর রিপোর্টকে আমরা সবচেয়ে বেশী সম্মান দিয়ে থাকি।

পরে এই সতীর্থ সেক্রেটারীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। বন্ধু হেসে বলেছিলেন, কিন্তু একটা বিপদ্ হল।

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন কর্‌লাম, কি?

—বিপদ হল এই যে তিনি এখন নিরুদ্বেগে এবং নির্ভয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে যেতে পারবেন। সার্টের উপর ডাঃ দাসের সার্টিফিকেট গাঁথা, তাঁকে পায় কে?

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, আমার কাছে তখন আবার রিপোর্ট করবেন, আমি নতুন ক'রে তদন্ত কর্‌ব।

—আপনিও ত রক্তমাংসের মানুষ, আপনার পূর্ব্বতন তদন্তের সিদ্ধান্ত আপনাকে খানিকটা prejudice করবে না কি?

সম্ভাবনাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে, সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে কয়মাস ঐ বিভাগে ছিলাম তার মধ্যে এই অফিসারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।

পাঁচ

শ্রীমতী ঘোষালের অভিযোগের কাহিনী একটু আগেই বলেছি। ব্যাপারটা কিন্তু ঐখানেই শেষ হয়নি।

দিন দুই পরে টেলিফোন বেজে উঠল—ডিরেক্ট লাইনটা।

টেলিফোন তুলে বল্‌লাম, আমি ডাঃ দাস বলছি।

অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এল, আমি কুমারী চক্রবর্ত্তী।

নামটা যেন কোথায় শুনেছি, কিন্তু ঠিক মনে আসছিল না। বল্‌লাম, বলুন।

—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি?

—বিষয়টা কি তা' একটু বলবেন?

—টেলিফোনে ত সব কথা বলা যায় না। আমি আপনার বেশী সময় নেব না, মিনিট পনেরো মাত্র।

সবাই বলেন, বেশী সময় নেবেন না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখেছি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে ফেলেন। দোষটা হয়ত আমারই: অনেক সময় নিজেই অবান্তর কাহিনীর জালে জড়িয়ে পড়ি, অথবা হয়ত মনে করি যে অবান্তর কথার মাঝ থেকেই প্রাসঙ্গিক কথা বেরিয়ে আসবে।

বল্‌লাম, তবু একটুখানি আভাস দিন্…

—পরশুদিন শ্রীমতী ঘোষাল আপনার সঙ্গে যে বিষয়ে দেখা করেছিলেন সেই বিষয় সম্পর্কে।

বিদ্যুতের ঝিলিকে মনে পড়ে গেল শ্রীমতী ঘোষালের অভিযোগ। তাঁরই মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কথা বল্‌ছেন টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

আমার উচিত ছিল বলা যে আমার সময় হবে না। কিন্তু

ভাবলাম, এক পক্ষের কাহিনী যখন শুনেছি তখন অপর পক্ষেরটাও শুনলে ক্ষতি কি? হয়ত আমার গল্পপিপাসু মনও খানিকটা উদগ্র হয়ে উঠেছিল।

বিকেলের দিকে এলেন কুমারী চক্রবর্তী। শান্ত দোহারা গড়ন, সুন্দরী বলা চলে না (সুন্দরী হ'লে আর কেরাণীর চাকুরী করতে আসবেন কেন?) তবে মুখে এমন একটা শ্রী আছে যা' অনেক পুরুষ মানুষকেই হয়ত আকৃষ্ট করে।

কোন প্রকার ভূমিকা না করে বল্‌লেন, শ্রীমতী ঘোষাল আমার এবং—মজুমদার সম্বন্ধে আপনার কাছে যা বলে গেছেন আমি শুনেছি। আমি বলতে এসেছি, সমস্ত মিথ্যে!

আগেই বুঝতে পেরেছিলাম শ্রীমতী ঘোষালের আমার কাছে আসার খবর ইনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন। আমার কাছে সহানুভূতি না পেয়ে শ্রীমতী ঘোষাল সোজা আক্রমণ করেছিলেন তাঁর স্বামীকে, কেন তিনি তাঁর নিজের দপ্তরে এই জাতীয় অনাচারের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। পরের দিন শ্রীযুত ঘোষাল বাধ্য হয়েছিলেন কুমারী চক্রবর্তীকে মোটামুটি সাবধান করে দিতে।

আমি প্রশ্ন করলাম, সমস্ত মিথ্যে?—মজুমদারের সঙ্গে আপনার কোনই সৌহার্দ্য নেই?

একটু লজ্জিতভাবে জবাব দিলেন, দেখুন, এক অফিসে কাজ করি, কথাবার্তা বিনিময় হয় বই কি। দু'এক সময় এক সঙ্গে চা'ও খেতে গিয়েছি। কিন্তু তার বেশী কিছুই নয়।

কুমারী চক্রবর্ত্তী এবং—মজুমদার কোথায় যান্ বা কি ভাবে সময় কাটান তা জান্‌বার অধিকার আমার নেই, কাজেই এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আমি করলাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্গে—মজুমদারের বিয়ের কোন সম্ভাবনা আছে কি?

একটু যেন রাঙা হয়ে উঠলেন কুমারী চক্রবর্তী। অথবা ওটা কি আমার চোখের ভুল?

বল্‌লেন, সম্ভাবনা কি করে থাকবে বলুন ? আমরা হচ্ছি ব্রাহ্মণ, ওঁরা কায়স্থ।…তা ছাড়া বরপণ দেবার ক্ষমতা আমার বাবার নেই।

এর উত্তরে অনেক কিছু বল্‌তে পারতাম। বলতে পারতাম, মনের মিল যদি হয়ে থাকে, তাহলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই বিভেদে আটকাবে না, বরপণও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, হৃদয়ের ডাক্তারও নই। আমি দুর্নীতিদমন বিভাগের নিতান্ত অরসিক সচিব মাত্র !

বল্‌লাম, আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। শ্রীমতী ঘোষালকে আমি এ কথা খুবই খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছি, আপনি ভয় পাবেন না।

বিদায় নেবার সময় কুমারী চক্রবর্তী বল্‌লেন, আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু শ্রীযুত ঘোষাল যখন ডেকে বল্‌লেন যে আপনার কানে এ সব পৌঁচেছে তখন আমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কুমারী চক্রবর্তী এবং—মজুমদার এতদিনে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন কিনা জানি না, যদি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন কি ?

ছয়

দুর্নীতিদমন বিভাগে একবছর কাজ করে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে অধিকাংশ দুর্নীতির পেছনেই রয়েছে নারীসংশ্লিষ্ট দুর্বলতা।

প্রধানতঃ দু'রকমের দুর্বলতা আমার নজরে এসেছিল। এক হচ্ছে, গৃহিণীর নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা কর্‌বার সাহসের অভাব। দ্বিতীয় হচ্ছে, পর-নারীর প্রতি আসক্তি।

প্রথম জাতীয় দুর্বলতার একটা কাহিনী বল্‌ব। কিন্তু প্রারম্ভেই গৃহিণী বা হবু-গৃহিণী পাঠিকাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছি।

তাঁরা যেন মনে না করেন যে আমার মতে তাঁদের স্বামীদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁরাই দায়ী। তাঁরা উপলক্ষ মাত্র, দোষ যদি থেকে থাকে সে হচ্ছে তাঁদের ভর্তাদের।...আমার আর একটা নিবেদনও আছে : তাঁরা যেন এই পরিচ্ছেদের প্রতি আমার প্রিয়তমা সহধর্মিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূচনা না করেন।

মাত্র কয়েকসপ্তাহ হল আমি তখন নতুন বিভাগের ভার নিয়েছি। খবর পেলাম একজন পদস্থ কর্মচারী তাঁর দপ্তরের সরকারী পরিবহনটি সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত করে নিয়েছেন, অথচ log-book-এ দেখাচ্ছেন গাড়ীটি যেন ব্যবহার করা হচ্ছে নানা সরকারী কাজে। অন্যান্য বিভাগের সচিবত্বকালে এ ধরণের অভিযোগ আগেও পেয়েছি, কিন্তু এখন যে খবরটি এল—সেটা হচ্ছে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে এবং অপব্যহারের মাত্রা যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। যিনি খবরটি এনেছিলেন তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সত্যি জানেন শ্রীযুত মিত্র এই জাতীয় অপব্যবহার করেছেন? হয়ত দু-একদিন সখ করে সিনেমা থিয়েটার গিয়েছিলেন মাত্র—মাসের পর মাস এইভাবে গাড়ীটা ব্যবহার কর্‌ছেন এটা যেন বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না!

—সত্যি বলছি, ডাঃ দাস। তবে log-book দেখে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। শ্রীযুত মিত্র বুদ্ধিমান্ লোক, কাগজে-কলমে সব কেতাদুরস্ত করে রেখেছেন।

—তাহলে অভিযোগ প্রমাণ হবে কি করে?

এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম আগন্তুকের কাছ থেকে আরও দুএকটা খবর বার কর্‌বার উদ্দেশ্যে। Log-book ছাড়াও যে অভিযোগ প্রমাণ করা যায় এটা আমার অজানা ছিল না।

—কেন? আপনি আপনার এজেন্টদের পাঠিয়ে দিন্ গাড়ীর

গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে। দরকার হলে ড্রাইভারকেও জেরা কর্তে পারেন।

—কিন্তু ড্রাইভারেরও ত চাকুরীর ভয় আছে। সত্যি কথা বল্‌বে কি ?

আগন্তুক বললেন, তাহলে আপনি আছেন কি করতে ? আপনিও যদি কোন উপায় উদ্ভাবন কর্তে না পারেন তাহলে অবাধে চলুক এই অপব্যবহার, উচ্ছন্নে যাক্ বাংলাদেশ !

আমি হেসে বল্‌লাম, এখ্‌খুনি এতটা হতাশ হয়ে পড়বেন না। আপনি যে খবর দিয়ে গেলেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই এর ফলাফল জান্‌তে পাবেন।

সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানের পর বুঝলাম যে খবরটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। শ্রীযুত মিত্রের নিজের কোন গাড়ী ছিল না। কারণ, কেন্‌বার এবং রাখবার ক্ষমতার অভাব। যে বেতন তিনি পেতেন (নিতান্ত কম নয়, দু'হাজারের বেশী) তার অধিকাংশই খরচ হত তাঁর সুরূপা ফ্যাসনদুরস্ত প্রিয়তমা গৃহিণীর অঙ্গসজ্জায়। শ্রীমতী মিত্র অবশ্য অন্দরমহলে বসে থাক্‌বার মত মহিলা নন্, তাঁকে যেতে হত এখানে-ওখানে নানা পার্টিতে, ক্লাব-এ, সিনেমা-থিয়েটারে। তাই, সরকারী পরিবহন থাকত তাঁদেরই ভাড়াবাড়ীর গ্যারেজে, প্রধানতঃ শ্রীমতীর পরিচর্যায়। শ্রীযুত মিত্র সেটাতে চড়ে শুধু অফিসে যেতেন এবং অফিস থেকে বাড়ীতে ফিরতেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ গাড়ীটাকে ব্যবহার করতেন এদিক-ওদিকের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজে। যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় সেজন্য তিনি গাড়ীটা যে বাংলা সরকারের এই চিহ্নটিও সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে দিয়েছিলেন।

ড্রাইভার প্রথমে কিছুতেই মুখ খুলতে রাজী হয়নি'। কারণ, শ্রীযুত মিত্র তাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যে

কর্তৃপক্ষ যদি কিছু জানতে পায় তাহ'লে সকলের আগে তার চাকুরীটি যাবে। আমি যখন তাকে আশ্বাস দিলাম যে এই অপরাধে কেউ তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না তখন সে সমস্ত কাহিনী খুলে বলতে রাজী হ'ল।

Log-book দেখে ত আমার চক্ষুস্থির! শ্রীযুত মিত্র বুদ্ধিমান লোক, নিজে কখনও খাতায় দস্তখত করতেন না। লিখতেন এবং দস্তখত করতেন তাঁর স্টেনোগ্রাফার। যাতে, প্রয়োজন হ'লে ভুলচুকের দায়িত্ব তিনি ফেলে দিতে পারেন বেচারী স্টেনোগ্রাফারের উপর। করেছিলেনও তাই, কিন্তু অনুসন্ধান করে log-book-এর অধিকাংশ entry যখন সম্পূর্ণ অলীক ব'লে প্রমাণিত হ'ল তখন শ্রীযুত মিত্র চুপ করে রইলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যবহারের সমর্থন ক'রে গিয়েছিলেন তিনি। আমার অফিসে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের কয়েকটি চুম্বক আপনাদের বল্‌ছি।

—মিঃ মিত্র, আপনার দ্বারা সরকারী পরিবহনের এরকম অপব্যবহার হবে আমি ভাব্‌তেও পারিনি'!

—অপব্যবহার? হ্যাঁ, দু-এক সময় আমার গৃহিণী এই গাড়ীতে চড়ে এখানে ওখানে গিয়েছেন বটে, কিন্তু আমার ড্রাইভার এবং স্টেনোগ্রাফার যে কাহিনী আপনাকে বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যা!

—আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করায় তাদের কি স্বার্থ থাক্‌তে পারে, মিঃ মিত্র?

—আমি কি ক'রে বল্‌ব, ডাঃ দাস?...তারপর একটু ভেবে বল্‌লেন, আমি একজন বেশ কড়া অধিকর্তা তা বোধহয় আপনি জানেন। আমার কড়া শাসনের প্রতিশোধ হয়ত ওরা নিচ্ছে!

এ জাতীয় ওজর আমি বহু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর কাছ থেকে পেয়েছি। কাজেই আমি না হেসে পারলাম না।

আমার হাসিতে শ্রীযুত মিত্র যেন একটু গরম হয়ে উঠলেন।

বললেন, তাছাড়া আপনারা বড় বড় আই-সি-এস্ অফিসার, আড়াই হাজার তিনহাজার টাকা মাইনে পান। আপনারা কি ক'রে বুঝবেন, অধস্তন অল্প মাইনের চাকুরেদের দুরবস্থা।

—কিন্তু আপনাকে কি নিতান্ত কম মাইনের পর্যায়ে ফেলা যায়, মিঃ মিত্র?

শ্রীযুত মিত্র এবার খুলে বললেন তাঁর দুঃসহ পরিস্থিতির কথা।

—দেখুন, আমি যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। বরাবর শিক্ষা পেয়ে এসেছেন বিলিতি স্কুলে, কলেজে, সমাজে ঘুরেছেন সবচেয়ে উঁচুস্তরের পরিবারদের মধ্যে। হয়ত আপনাদের মত আই-সি-এস্ এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল—আমার আজকার এই দুর্ভোগ আপনাদের সঙ্গে সমান তালে ওঁর চলবার প্রয়াসের জন্য।

কথাটা অত্যন্ত আংশিকভাবে সত্য। আমরা, আই-সি-এস্ কর্মচারীরা, সর্বদা সৌখীন সমাজে ঘুরে বেড়াই না। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যয়ের মাপকাঠি যদি হয়—যারা ফ্যাসনেব্‌ল্ তারা কি করেছে—তাহ'লে আইনানুমোদিত আয়ে খরচ সংকুলান করা কখনও সম্ভব হতে পারে না।

কিছুদিন পরে শুন্‌লাম শ্রীযুত মিত্রের সঙ্গে শ্রীমতীর অত্যন্ত মন কষাকষি চলেছে। আরও মাস তিনেক পরে খবর পেলাম শ্রীমতী তাঁর স্বামীকে পরিত্যাগ করে একজন পাঞ্জাবী কর্ণেলের সঙ্গে দিল্লী চলে গিয়েছেন, আর শ্রীযুত মিত্র চাকুরী থেকে অবসরের আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেছেন।

সাত

সরকারী পরিবহনের অপব্যবহার শুধু বাংলাদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর এই অপব্যবহার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ দু'টি।

প্রথম, মোটরগাড়ীর দাম এবং তা' চালাবার মাসিক খরচ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধের আগে ছোট একখানা গাড়ীর দাম ছিল আড়াই-তিন হাজার টাকা, পেট্রোল পাওয়া যেত এক-টাকা, এক টাকা চার আনা প্রতি গ্যালন। তাছাড়া আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দামও অনেক কম ছিল। এখন, দশবারো হাজার টাকার কমে কোন গাড়ী পাওয়া যায় না, পেট্রোল এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম হয়েছে তিনচার গুণ। অথচ মধ্যস্থানীয় বা উচ্চ-স্থানীর কর্মচারীদের মাইনে প্রায় আগের মতই রয়েছে। যে সামান্য মাগ্‌গিভাতা দেওয়া হয় তাতে খাওয়া খরচেরই সংকুলান হয় না, গাড়ী কেনা বা রাখা ত আকাশকুসুম স্বপ্ন! পক্ষান্তরে, যাঁরা সরকারী কর্মচারী নন্ তাঁদের আয় অনেক বেড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তাঁদের প্রদর্শন। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের সরকারী পরিবহন অপব্যবহার করার লোভ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়, সরকারী কাজ নানাদিকে বেড়েই চলেছে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে সরকারী পরিবহনের সংখ্যা। স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ নিয়ে দেখা গেছে যে ১৯৪৭ সালের অনুপাতে ১৯৫৮ সালে সরকারী পরিবহনের সংখ্যা (আমি ট্রাক, লরী বা প্রদর্শনী-বাহনের কথা বল্‌ছি না) দাঁড়িয়েছে কুড়ি-পঁচিশ গুণ। এই সব পরিবহন কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তার বিশদ্ নিয়ম সরকার বেঁধে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার ব্যতিক্রম হচ্ছে নানা দপ্তরে। নিয়মগুলো ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা' দেখবার ব্যবস্থা অত্যন্ত কাঁচা, যার ফলে

অপব্যবহার চলেছে অবাধে, নিঃসঙ্কোচে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁরা সর্বোচ্চপদে আসীন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এই অপব্যবহার করেন বা অপব্যবহারের প্রশ্রয় দেন। ফল হয় এই যে মাত্রা ছাড়িয়ে-যাওয়া অপব্যবহারের বিরুদ্ধে action নেবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে।

দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব হিসেবে অনেক অপব্যবহারের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার প্রয়াস ফলপ্রসূও হয়েছে।

আগেই বলেছি যে নারীসংশ্লিষ্ট দুর্বলতার ফলে অনেক দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। পরনারীর প্রতি আসক্তি যে কোন কোন পুরুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত ক'রে তুল্‌তে পারে, তারই একটা কাহিনী বল্‌ছি।

একদিন ডাকে একখানা বেনামী চিঠি পেলাম। তাতে লেখা রয়েছে যে অমুক সরকারী গাড়ী প্রতিদিন বেলা এগারোটায় কল্‌কাতারই উপকণ্ঠে একটি বাগানঘেরা বাড়ীতে আসে। একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে গাড়ীটি যায় কল্‌কাতার অপর প্রান্তে, যেখানে মহিলাটি কাজ করেন। সারাদিন সেখানে থাকে, তারপর তাঁকে নিয়ে গাড়ীটি এসে দাঁড়ায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দক্ষিণে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ সেক্রেটারিয়াটের একজন পদস্থ কর্মচারী মিলিত হন্ সান্ধ্য-ভ্রমণে, নতুবা কোন রেস্তরাঁয়। রাত আন্দাজ আটটার সময় গাড়ীটি আবার যায় কলকাতার বাইরে, প্রথমে মহিলাটি নেমে যান্ তাঁর বাড়ীতে, তারপর কর্মচারীটি আসেন তাঁর ফ্ল্যাট-এ। অবশেষে গাড়ীটি ফিরে যায় সরকারী গ্যারেজে।

আমার দপ্তরের একজন বিশ্বস্ত এজেন্টকে পাঠালাম এই গাড়ীটির গতিবিধির উপর নজর রাখতে। এক সপ্তাহ পরে রিপোর্ট এল, খবরটা একেবারে বাজে, ঐ নম্বরের বা অন্য কোন নম্বরের সরকারী গাড়ী বেলা এগারোটার সময় ঐ বাগানঘেরা বাড়ীতে দেখা যায়নি।

মনে ধাঁধাঁ লাগল। আমার এজেন্টকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু ছিল না, তবু ডাক্‌লাম আমার সহকর্মী একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট্ কমিশনারকে।

বললাম, দেখুন, এই এজেন্টকে আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু খবরটা একেবারে মিথ্যে বলে মেনে নিতেও আমার মন চাইছে না।...আপনি আর কাউকে পাঠান্।

আরও এক সপ্তাহ পরে রিপোর্ট এল, খবরটা মোটেই বাজে নয়, নিতান্ত সত্যি। তবে সময়ের একটু তারতম্য থাকায় প্রথম এজেন্ট ঠিক ধরতে পারেনি। গাড়ীটা ওখানে আসে বেলা ন'টায়, এগারোটায় নয়। প্রথম এজেন্ট বেলা দশটা থেকে উপস্থিত ছিল, গাড়ী তখন আরোহিণীকে নিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেছে।

আবার ডাক্‌লাম অ্যাসিস্টান্ট কমিশনারকে। বল্‌লাম, দেখুন, মনে হচ্ছে এঁর পেছনে অনেকখানি রহস্য লুকানো আছে। এই তদন্তে আমি নিজে অংশ নিতে চাই। দপ্তরে বসে ফাইল ঘেঁটে, আর নানালোকের statement শুনে ক্লান্ত বোধ কর্‌ছি, চলুন, আপনাদের সঙ্গে আমিও ওঁদের shadow করি।

হু'দিন পর পর আমি নিজে এই গাড়ীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। আমরা জোগাড় করেছিলাম আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের অতি সাধারণ একটি প্রাইভেট গাড়ী, এবং আমাদেরই একজন অফিসার হয়েছিলেন গাড়ীর চালক। অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, আর একজন কর্মচারী এবং আমি হয়েছিলাম অন্য তিনজন আরোহী। সবাই সিভিলিয়ান্ পোষাকে—পুলিশের কর্মচারীরা ছদ্মবেশে। আমার পরণে সাধারণ ট্রাউজার্স ও বুস্‌সার্ট।

বাড়ীতে গৃহিণীকে বল্‌লাম, ফিরতে রাত হবে, secret duty আছে।

উদ্বিগ্নমুখে গৃহিণী প্রশ্ন কর্‌লেন, বিপদের কোন আশঙ্কা নেই ত? রিভল্‌ভারটা সঙ্গে নিয়েছ?

হেসে জবাব দিলাম, যে কাজে যাচ্ছি তাতে রিভলভারের প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না। তাছাড়া, অপঘাতে মৃত্যু যদি কপালে লেখা থাকে তাহলে হাজার রিভলভারও আমাকে বাঁচাতে পারবে না!

গৃহিণী আমার জবাবে মোটেই আশ্বস্ত হন্‌নি।

আট

সে যাই হোক্, সেদিনকার মত অফিসের ফাইলগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে আমরা সোজা চলে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে। একটু দূরে আমরা অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ন'টা বাজতেই এসে পড়ল সেই গাড়ী এবং সোজা ঢুক্‌ল বাগানঘেরা বাড়ীর ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে এল একজন মহিলাকে নিয়ে।

পরবর্তী গন্তব্যস্থান আমরা আগে থেকেই জানতাম, তাই গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন আমরা করলাম না। অন্য পথ ধরে আমরা পৌঁছলাম দক্ষিণ কলকাতায়, যেখানে এক অফিসে মহিলাটি কাজ করেন। গিয়ে দেখি, গাড়ী অফিসের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে—ড্রাইভার বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে।

দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এক ঠাঁয়ে অপেক্ষা করাটা হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। অপেক্ষা কর্‌তেই হবে, কারণ, বলা ত যায় না, হয়ত সুমিত্রা দেবী (এটা অবশ্য আমার দেওয়া কাল্পনিক নাম) সেদিন বেরিয়ে পড়বেন পাঁচটার অনেক আগে!

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হল যে আমরা গাড়ী নিয়ে থাকব কাছাকাছি এক পার্কএর সামনে, আর আমাদেরই অন্যতম ছদ্মবেশী অফিসার নজর রাখবেন সরকারী গাড়ীটার গতিবিধির উপর। প্রয়োজন হলে (অর্থাৎ সুমিত্রা দেবী যদি পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়েন) পার্কে এসে আমাদের খবর দেবেন।

আমাদের ছুর্ভাগ্য, সুমিত্রা দেবী পাঁচটার এক মিনিটও আগে বেরুলেন না। আমাদের মাধ্যাহ্নিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম পথের ধারের একটা কেবিন্‌এ চা বিস্কুট এবং ডবল ডিমের অম্‌লেট গলাধঃকরণ ক'রে!

ফেরার পথে সুমিত্রা দেবীকে একটু ভালভাবে লক্ষ্য কর্‌বার সুযোগ পেলাম। ভেবেছিলাম দেখব, সুমিত্রা দেবী রূপবতী কাঁচা বয়সী একজন মহিলা। হতাশ হলাম, যখন দেখলাম, তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে! আর রূপবতী ত ননই, রূপহীনা বল্‌লেই ঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বোধ হয় আমার মুখে নৈরাশ্যের ছায়া লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, আপনার গল্পের নায়িকা হ'বার উপযুক্ত নয় বোধ হয়, স্যার!

বললাম, সব গল্পের নায়িকাই যে সুশ্রী হবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, হ্যাঁ, disappointment বোধ করছি বই কি!

যথারীতি সরকারী গাড়িটি রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ এসে হাজির হল। আমরাও এলাম তার পেছনে পেছনে।

ছ'টা বাজবার কয়েক মিনিট আগে আমাদের নায়ক এসে ঢুকলেন সরকারী গাড়ীতে। গাড়ী ছুটল পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে। আমরাও পশ্চাদ্ধাবন কর্‌লাম।

পরবর্তী ষ্টপ্‌ কোয়ালিটি রেস্তঁরা। ওঁরা ছু'জনে ভেতরে ঢুকে গেলেন, বোধহয় আইসক্রিম খেতে, আর আমরা শুক্‌নো মুখে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

তারপর নিউমার্কেট। দেখলাম, ওঁরা ঢুকলেন একটা শাড়ীর দোকানে। বেরিয়ে এলেন একটা প্যাকেট হাতে ক'রে। বুঝ্‌লাম, এটা হচ্ছে দক্ষিণা।

তখন রাত হয়ে এসেছে। শ্রীযুত বসু এবং সুমিত্রা দেবী

চল্‌লেন উট্রাম ঘাটে! জলের ধারে গিয়ে বস্‌লেন দু'জনে, গা' ঘেঁষে।

উট্রাম ঘাটে ওঁরা বোধহয় ছিলেন একঘন্টারও বেশী। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য কর্‌ছিলাম, ওঁদের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাইনি'।

তারপর উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। ওঁরা যথারীতি নেমে পড়লেন নিজেদের বাড়ীতে, প্রথমে সুমিত্রা দেবী, তারপর শ্রীযুত বসু।

আমি যখন বাড়ীতে পৌঁছুলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমাকে সুস্থশরীরে ফির্‌তে দেখে গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

নয়

দ্বিতীয় দিনও রুটিনটা প্রায় ঐরকমই ছিল, শুধু আমি আমার অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম লাঞ্চ্‌এর পর। ওঁরা অবশ্য আগেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁদের উপর নির্দেশ ছিল প্রয়োজন হ'লে আমাকে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটএ টেলিফোন করবেন।

এবার রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে কফি-হাউস। আমি বললাম, ভদ্রলোক একটু মিতব্যয়ী হয়ে উঠেছেন যেন!

আমার ভুল আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

মুস্কিল হ'ল কফি হাউস থেকে ওঁরা বেরুবার পর। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা সাতটার সময় চিত্তরঞ্জন এভিনু এবং এসপ্লেনেড্‌এর জংশনে যে ভীড় হয় তার মধ্যে দিয়ে দূরত্ব রেখে কোন গাড়ীকে shadow করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। এস্‌প্লেনেডএর মোড়ে শ্রীযুত বসু এবং সুমিত্রা দেবীর গাড়ী বেরিয়ে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক লাইট্ হয়ে গেল প্রথমে হলুদ, তারপর লাল।

আমাদের গাড়ীর চালক জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, এ ত পুলিশের গাড়ী নয়, থাম্‌তেই হ'বে।

—অসম্ভব।...আমি বল্‌লাম।...আমি হুকুম দিচ্ছি, আপনি চালিয়ে যান, ফলাফলের জন্য দায়ী আমি।

গাড়ীর চালক পুলিশের কর্ম্মচারী, আমি হচ্ছি সিভিলিয়ান, আমার হুকুম তাঁর কাছে বোধহয় যথেষ্ট মনে হ'ল না। তিনি তাকালেন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের দিকে।

ভীষণ বিরক্তি বোধ করলাম আমি। তীব্রকণ্ঠে বল্‌লাম, আজ যদি ওঁদের শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারি তাহ'লে আমি দায়ী কর্‌ব আপনাকে।

এবার দ্বিরুক্তি না করে চালক চাপলেন accelerator, বোঁ ক'রে বেরিয়ে এল আমাদের গাড়ী চৌরঙ্গীর রাস্তায়। কয়েক ইঞ্চির জন্য একটা বড় বাস-এর সঙ্গে কলিশনের হাত থেকে রেহাই পেলাম আমরা। পেছন ফিরে দেখলাম, বেচারী ট্র্যাফিক কন্‌ষ্টেবল্ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে!

এবারও সেই নিউমার্কেট এবং শাড়ীর দোকান। আমি বললাম, দক্ষিণাটা যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তারপর আবার সেই উট্রাম ঘাট, কিন্তু বায়ুসেবনকারীদের ভিড় যেন বেশী। সুমিত্রা দেবী কয়েক মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন, বিরক্তবোধ করে গাড়ীতেই ফিরে এলেন। তাঁদেরই নির্দেশে ড্রাইভার বেরিয়ে এসে বস্‌ল একটু দূরে, একটা বেঞ্চির একপ্রান্তে।

প্রায় একঘণ্টা যাবৎ চলল তাঁদের সংলাপ। আমার মন উস্‌খুস্ কর্‌ছিল ওঁদের surprise করে দিতে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত কর্‌লাম। ভাবলাম, আহা, বেচারী, গৃহিণীর সাহচর্য হয়ত অত্যন্ত বিস্বাদ ঠেকে, প্রিয়বান্ধবীর সঙ্গে এই নির্দোষ মধুর tete-a-teteএ বাধা দেওয়া হবে অত্যন্ত অরসিকের কাজ।

ঘণ্টাখানেক পরে শুন্‌লাম ওঁদের গাড়ীর হর্ণ বাজছে। ড্রাইভার এসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। আমরাও চল্‌লাম পেছনে পেছনে।

এবার ব্রাবোর্ণ রোড। হঠাৎ গাড়ী থামল একটা স্বল্পালোকিত গলির সামনে।

ব্যাপার কি? অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি তাকালাম আমার সঙ্গীয় কর্মচারীদের দিকে।

না, আমাদেরই ভুল। কোন খারাপ উদ্দেশ্য ওঁদের নেই। গলির মোড়ে একটা রকমারী ষ্টোর্স, সেখান থেকে শ্রীযুত বসু কিন্‌লেন কিছু প্রসাধন সামগ্রী! লক্ষ্য করলাম, প্যাকেটটি যথারীতি সুমিত্রা দেবী গ্রহণ কর্‌লেন।

গাড়ী শ্রীযুত বসুকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে (সুমিত্রা দেবী আগেই নেমে গিয়েছিলেন) যখন গ্যারেজের দিকে রওনা হয়েছে তখন আমরা বোঁ করে বেরিয়ে এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়ালাম। সরকারী গাড়ীর ড্রাইভারকে বল্‌লাম গাড়ী থামাতে।

সে খানিকটা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের পরিচয় পাবার পর সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম যে তার কোন ভয় নেই, আমরা শুধু চাই তার বিবৃতি, আর দেখতে চাই সরকারী পরিবহন সংক্রান্ত স্লিপ্‌টি।

ড্রাইভারকে নিয়ে আসা হ'ল আমাদের দপ্তরে। রাত দশটা অবধি তার বিবৃতি লেখা হ'ল। স্লিপটিও আমরা বাজেয়াপ্ত কর্‌লাম। যা ভেবেছিলাম তাই—স্লিপটি শ্রীযুত বসুই দস্তখত করেছেন, কিন্তু লিখেছেন যে গাড়ী সারাদিন ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ —সরকারী ডিউটিতে।

শ্রীযুত বসুর কি শাস্তি হয়েছিল তা' আমি বল্‌বনা, তবে এটুকু বলতে পারি যে বেশীদিন তাঁকে সরকারী চাকুরী করতে হয়নি'। যথা সময়ে আমরা জেনেছিলাম যে তাঁর স্ত্রী জীবিতা, কিন্তু চিররুগ্না,

তাই বাইরে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন। বাড়ীতে দু'টি ছেলে, তিনটি মেয়ে আছে, সবচেয়ে ছোটটির বয়স মাত্র তিন।

সুমিত্রা দেবীর কথা জান্‌তে চান? তিনি কুমারী, অন্ততঃ আমাদের অনুসন্ধানে ত তাই বলে। বাইরে তিনি শ্রীযুত বসুর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী বলে পরিচিত, কিন্তু আমরা জানি তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় সম্পর্কের কোন বালাই ছিল না।

কোন অফিসারের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা আমাদের বিভাগের নীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুত বসু এবং সুমিত্রা দেবীর সম্প্রীতি নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাতাম না, যদি এক দুর্বল মুহূর্তে শ্রীযুত বসু সরকারী গাড়ীটা তাঁর প্রিয়বান্ধবীর ব্যবহারে অর্পণ না কর্‌তেন।

একটা বিষয় আজও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে চিত্তবিনোদনের আকাঙ্ক্ষা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সারা কল্‌কাতা খুঁজে এক সুমিত্রা দেবী ছাড়া আর কোন বান্ধবীই কি শ্রীযুত বসু পেলেন না?

শ্রীমতী বসু এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন কি?

দশ

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, দুর্নীতি অনুসন্ধান ক'রে বেড়ানো আপনার পেশা, ডাঃ দাস, কিন্তু যাঁরা আপনার দপ্তরে কাজ করেন তাঁরা সবাই কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? আপনি কি হলফ ক'রে বল্‌তে পারেন যে নিজেদের অসাধুতা গোপন করবার প্রয়াসে আপনার সহায়কেরা কখনও অন্যের ঘাড়ে অপরাধের বোঝা চাপান্‌ না?

হলফ করে এত বড় কথা বল্‌বার ধৃষ্টতা আমার নিশ্চয়ই নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে এই দপ্তরে অনুসন্ধানের পদ্ধতি এমন বাঁধাধরা যে কারো পক্ষেই একের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে

চাপানো সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, দপ্তরের সচিব যদি সক্রিয় এবং সজাগ থাকেন তাহ'লে এসব সম্ভাবনার কথা উঠতেই পারে না।

তার মানে এই নয় যে দুর্নীতিদমন দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সবাই অতিমানুষ বা দেবতা। মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাঁদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু সেই দুর্বলতা তদন্তাধীন কেস্‌এর মধ্যে রূপায়িত হবার সুযোগ খুবই কম।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলেছে, অভিযোগ যে একশ্রেণীর লাইসেন্স দেওয়া বিষয়ে তিনি বরাবর পক্ষপাতিত্ব করে এসেছেন, যাঁদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাঁরা হয় তাঁর বন্ধুস্থানীয় বা বন্ধুদের দ্বারা অনুমোদিত, অথবা বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে দর্শনী নেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত অভিযোগ প্রমাণ করা অবশ্য খুবই কঠিন, কারণ যাঁরা দর্শনী দেন্‌ তাঁরা পরে কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে চান্‌না যে দিয়েছেন, আর যিনি দর্শনী নেন্‌ তিনি নিশ্চয়ই এত বোকা নন্‌ যে কোন সাক্ষীকে সাম্‌নে রেখে তাঁর পাওনা গ্রহণ কর্‌বেন।

এক্ষেত্রেও অনুসন্ধানের ফল দাঁড়াল এই যে দু'একজন ছাড়া কেউই বল্‌তে সাহস পেলেন না যে উল্লিখিত কর্মচারীটিকে কিছু দিয়েছেন। তাঁরা শুধু বল্‌লেন যে তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা দেন্‌নি'।

অথচ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি ঘেঁটে আমার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না যে কর্মচারীমহোদয় অসাধু। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল অবাঞ্ছিত কয়েকজনকে কেন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা উপযুক্ত তাঁদের আবেদন কেন না-মঞ্জুর করা হয়েছে, তখন তিনি জবাব দিলেন যে বাঁধাধরা নিয়মকানুন সত্ত্বেও খানিকটা discretion ব্যবহার করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং নিজের discretion অনুযায়ী তিনি কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি পাল্‌টা অভিযোগ কর্‌লেন যে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী উভয়েই পক্ষপাতদুষ্ট।

অভিযোগকারীর লাইসেন্স তিনি মঞ্জুর করেন নি' এবং তদন্তকারীর এক বন্ধুর লাইসেন্সএরও সেই একই অবস্থা হয়েছিল।

অভিযোগকারী অবশ্য তাঁর প্রাথমিক অভিযোগেই বলেছিলেন যে অন্যায়ভাবে কর্মচারী মহোদয় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। বস্তুতঃ আমাদের কাছে তিনি এসেছেন এই অন্যায়ের একটা প্রতিকারের জন্য।

সমস্যায় পড়লাম যখন তদন্তকারী অফিসারকে প্রশ্ন করলাম তাঁর বন্ধুর লাইসেন্স সম্পর্কে। তিনি স্বীকার করলেন যে কথাটা সত্যি, তবে তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন যে এক্ষেত্রে তাঁর বিচার-বুদ্ধি বা objectivity এতটুকু ব্যাহত হয়নি।

হয়ত তাই, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা অনেক সময় তার নিজেরই অগোচরে প্রভাব বিস্তার করে।

অভিযুক্তকে সব সময় সন্দেহের সুযোগ (benefit of doubt) দিতে হবে এই নীতি অনুসরণ ক'রে আমি অভিযুক্ত কর্মচারীটিকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হলাম, কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা থেকে গেল।

এর অনেকদিন পরে (আমি তখন সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি) শুন্‌লাম যে কর্মচারী মহোদয়ের লোভ এত বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি বেশ একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন এবং সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (suspend) করেছেন।

এগারো

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং যুদ্ধোত্তরযুগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ (control and regulation) এত ব্যাপক হয়েছে যে দুর্নীতির সুযোগ আগের চেয়ে শতগুণ বেড়েছে। জনসাধারণকে এখন পদে পদে ধন্না দিতে হয় কোন না কোন সরকারী দপ্তরে, কেননা তাদের

অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে যদি সময় মত পারমিট্, লাইসেন্স ইত্যাদি না পাওয়া যায়। এদিকে সরকার আবার এমন সব আইন-কানুন তৈরী ক'রে রেখেছেন যে সর্বনিম্ন কেরাণীও ইচ্ছা কর্‌লে খানিকটা প্রতিবন্ধকতা করতে পারেন। ফল হয় এই যে অনেক ক্ষেত্রে প্রথম একদফা দর্শনী দিতে হয়, যাতে কোন টেক্‌নিক্যাল বাধার সৃষ্টি না হয়। তারপর, পারমিট বা লাইসেন্স পেতে হ'লে যে কত খড় পোড়াতে হয় তা' একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। যুদ্ধপূর্বযুগে যে জাতীয় উৎকোচ দান বা গ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল আদালতের পেস্কার বা শমনজারী পেয়াদাদের মধ্যে তা' এখন ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য দপ্তরে।

সরকার যে এই পরিস্থিতির কথা জানেন না এমন নয়। তাঁরা খুব ভাল ভাবেই জানেন, কিন্তু নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁদের অনেক সময় বল্‌তে হয়. যে বাইরে যে সব অভিযোগ শোনা যায় তা' অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।

এজন্য আমি সরকারকে দোষ দিতে পারি না, কারণ কোন সরকারই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কর্‌তে পারেন না যে তাঁদের দপ্তরে নানা প্রকার দুর্নীতি চলেছে, অথচ তাঁরা তা' বন্ধ কর্‌তে অসমর্থ!

দুর্নীতিদমন দপ্তরে কাজ করে আমিও দেখেছি, এই জাতীয় ব্যাপক দুর্নীতি দূর করা কত কঠিন। বৃটিশ যুগে আদালতের পেস্কার-পেয়াদাদের মধ্যে যে উৎকোচ গ্রহণের রীতি ছিল তা' কে না জান্‌ত? অথচ তা' দূর করা সম্ভবপর হয়েছিল কি?

এ জাতীয় দুর্নীতি কমানো যেতে পারে তিন উপায়ে।

প্রথম, জনসাধারণের বিবেক-বুদ্ধি এবং নৈতিক সাহসকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। আপাতঃ সুবিধার লোভে না পড়ে তারা এক সঙ্গে যদি বদ্ধপরিকর হয় যে কিছুতেই তারা উৎকোচ দেবে না তাহ'লে উৎকোচপ্রার্থীদের সংখ্যা এবং দাবীও কমে আসবে।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক দপ্তরের অধিকর্তাকে এই জাতীয় দুর্নীতি

সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাক্‌তে হবে। অধিকর্তা যদি সাধু হন্ এবং সজাগ থাকেন তাহ'লে অধস্তন কর্মচারী বা কেরাণীরা কিছুতেই উৎকোচ নিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে ত নয়ই, পরোক্ষভাবেও নয়।

তৃতীয়, নিয়ন্ত্রণের নাগপাশটা খানিকটা অন্ততঃ শিথিল করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত এবং উদ্যোগী হতে হবে। মহাত্মা গান্ধী যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের এত বিরোধী ছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারী উভয় শ্রেণীকেই অসাধু করে তোলে। নিয়ন্ত্রণ যদি নিতান্তই রাখতে হয় তা'হলে লাইসেন্স বা পারমিট দেবার পদ্ধতি যতদূর সম্ভব সরল এবং সহজ কর্‌তে হবে। তাছাড়া প্রতি ছ'মাস এক বছর অন্তর পরীক্ষা কর্‌তে হবে যে, যে সব দপ্তর থেকে লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া হয় সেখানে কাজ সুষ্ঠু এবং সাধুভাবে চল্‌ছে কিনা। এই পরীক্ষা করবেন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন্ এমন কোন বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তি। বেসরকারী বল্‌ছি এই জন্য যে সরকারী কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষায় ব্যবস্থার গলদ প্রকাশিত না হবার সম্ভাবনাই বেশী।

খাদ্য এবং জনসাধারণের অতি আবশ্যকীয় কতকগুলো জিনিসের (যথা সিমেণ্ট, লোহা) সরবরাহ এবং বণ্টন বিষয়ে দুর্নীতির অনেক অভিযোগই আমি পেয়েছি এবং তদন্ত করে সরকারের নজরেও তা এনেছি। অধিকাংশক্ষেত্রেই সরকার যথোপযুক্ত action ও নিয়েছেন। তবু দুর্নীতি কমেনি, কারণ ছুট্‌কো-ছাট্‌কা শাস্তি দানে এই প্রকার ব্যাপক দুর্নীতি কম্‌তে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনটি উপায়ের কথা আমি বলেছি তা' অনুসরণ কর্‌লে এই সব ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতা অনেক কমে আস্‌বে।

বারো

সিমেণ্ট এবং লোহা সরবরাহ এবং বণ্টন সম্পর্কিত যে অসংখ্য কেস্ আমাকে তদন্ত কর্‌তে হয়েছিল তার দু' একটির কথা উল্লেখ কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছি না।

জানা গেল যে কয়েক মাস ধরে একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ীপ্রতিষ্ঠানকে লোহার পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তা নির্ভয়ে বিক্রী করে দিচ্ছেন কালোবাজারে। অভিযোগটা প্রথমে এসেছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে। তিনি মামুলি অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে অভিযোগ মিথ্যা, যারা পারমিট পায়নি' তাদের স্বাভাবিক ঈর্ষাপ্রসূত।

এই কর্মচারীটি নিজে অসাধু নন্, কিন্তু বিভাগীয় অনুসন্ধানে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন তাঁর এমন একজন অধস্তন কর্মচারীর উপর যিনি নিজে এই পারমিট দেওয়া এবং কালোবাজারে বিক্রী করার ষড়যন্ত্রে একজন বড় অংশীদার। বিভাগের খাতাপত্র এবং রেজিষ্টার পরীক্ষা করেই উর্ধ্বতন কর্মচারিটি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যে সব মৌলিক নথির উপর ভিত্তি করে এই সব রেজিষ্টার রাখা হয় তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি।

অভিযোগটা আমার দপ্তরে এসেছিল সম্পূর্ণ অন্য এক মহল থেকে। বিভাগীয় অনুসন্ধানের উল্লেখও সেখানে ছিল। এই কারণে প্রারম্ভেই অনুসন্ধান আমি নিজে পরিদর্শন করতে সুরু করেছিলাম।

দেখা গেল, অনেক মৌলিক নথি কোথায় উধাও হয়ে গেছে! যথারীতি এ দোষ চাপাচ্ছে ওর ঘাড়ে, ও দোষ চাপাচ্ছে এর ঘাড়ে।

তবু প্রমাণ (evidence) সংগ্রহ কর্‌বার চেষ্ট কর্‌তে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দিলাম যে অবিলম্বে যেন প্রতিষ্ঠানটিকে লোহার পারমিট দেওয়া বন্ধ করা হয়।

উক্ত দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মচারীটি প্রথমে আমার নির্দেশানুসারে কাজ কর্তে রাজী হন্নি, বলেছিলেন যে আমার final রিপোর্ট দেখে যা করণীয় কর্বেন। কিন্তু আমি যখন জোর করে বল্লাম যে প্রমাণসহ রিপোর্ট পেশ কর্তে সময় লাগবে এবং ততদিন এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হবে না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির উপর তিনি নোটিশ জারি কর্লেন।

এর দু'দিন পরে আমার একজন সহকারী ছুট্তে ছুট্তে এসে আমাকে বল্লেন, আপনি কি করেছেন স্যার!

—কেন? কি হ'ল আবার?

—আপনার নির্দেশে—কোম্পানীকে লোহা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ওদের ডিরেক্টাররা যে হুলুস্থূল কাণ্ড সুরু করেছেন!

—আঁতে ঘা পড়লে চঞ্চল হবেন বই কি!...আমি নির্বিকারভাবে মন্তব্য কর্লাম।

—না স্যার, ব্যাপারটা একটু জটিল। এই কোম্পানীর সবচেয়ে জোরালো ডিরেক্টার হচ্ছেন শ্রীমতী গাঙ্গুলী!

আমি যেন কিছুই বুঝতে পার্ছিনা এই ভাণ ক'রে প্রশ্ন কর্লাম, শ্রীমতী গাঙ্গুলী? তিনি আবার কে?

—আপনি শ্রীমতী গাঙ্গুলীর নাম শোনেন্ নি, স্যার? দিল্লী এবং কল্‌কাতার বড় বড় কর্মচারীরা ওঁর ফ্ল্যাট্এ কক্‌টেল্ খেতে আসেন, অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর জানাশুনো। নোটিশের বিরুদ্ধে আপীল উনি নিশ্চয়ই কর্বেন এবং আপনার নির্দেশ কিছুতেই বহাল থাকবে না। উল্টে আপনি নিজে বিপদে পড়বেন।

আমি হেসে বল্লাম, ওঃ, এই?...আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপীল টিঁক্‌বে না। যাঁদের কাছে শ্রীমতী গাঙ্গুলী দরবার করেছেন তাঁরা আমাকেও একটু-আধটু চেনেন্, আমার নির্দেশ রদ্ করবার মত সাহস তাঁদের নেই। তাঁরা জানেন যে প্রমাণ না পেয়ে এই step নেবার কথা আমি বলিনি।

—ধরুন্ কোন মন্ত্রী যদি আপনাকে অনুরোধ করেন এই নির্দেশ প্রত্যাহার ক'রে নিতে ?

—আপনি ভাববেন না। এ রকম অনুরোধ এলে তার কি জবাব দিতে হবে তা ডাঃ দাস জানেন। তবে এটাও আপনাকে বলে রাখছি, এ রকম অনুরোধ আদৌ আস্‌বে না। তার কারণও একই—ডাঃ দাসকে অন্যায় অনুরোধ করতে অনেকেই সঙ্কোচ বোধ করেন!

হয়েছিলও তাই। ওপরওয়ালার কাছে আপীলও মঞ্জুর হয়নি, আর আমাকেও কেউ অনুরোধ করেন্ নি' আমায় নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে।

কোন দিকেই যখন কোন সুরাহা হ'ল না তখন একদিন শ্রীমতী গাঙ্গুলী নিজেই এসে উপস্থিত হলেন আমার দপ্তরে।

তেরো

আগেই টেলিফোন্ করে তিনি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নিয়েছিলেন। অপর পক্ষের কি বক্তব্য আছে তা শুন্‌তে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, তাই আমি এক কথায় রাজি হয়েছিলাম তাঁকে আমার খানিকটা সময় দিতে। তা ছাড়া শ্রীমতী গাঙ্গুলীর কথা এত শুনেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার লোভটাও বোধ হয় আমার অবচেতন মনে ছিল।

যথাসময়ে শ্রীমতী গাঙ্গুলী এলেন। সুশ্রী দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল, চোখে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। প্রসাধনে বাহুল্য নেই, আছে সুরুচির পরিচিতি। দিল্লী এবং কল্‌কাতার বড় বড় কর্মচারীরা ওঁর ফ্ল্যাটএ কক্‌লেট খেতে কেন আসেন তার কিছুটা কারণ বুঝতে পারলাম।

তাঁকে বস্‌তে বল্‌লাম। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

—কোন ভূমিকা কর্‌ব না, ডাঃ দাস। আপনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তার ফলে আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। অথচ, আমি বা আমার কোম্পানির কেউই কোন বে-আইনি কাজ করিনি। আপনি নিতান্ত সন্দেহের বশে আমাদের এই শাস্তি দিয়েছেন।

বল্‌লাম, মাপ কর্‌বেন, শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করে কাজ করা আমার রীতি নয়। প্রমাণ পেয়েছি ব'লেই…

আমার কথা শেষ না হতেই শ্রীমতী গাঙ্গুলী বল্‌লেন, প্রমাণ যদি পেয়েই থাকেন তাহ'লে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস্ আরম্ভ করুন্ না! তা'ও কর্‌বেন না, অথচ আমাদের এমন হয়রান্ করবেন, এটা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি, ডাঃ দাস!

বুঝলাম শ্রীমতী গাঙ্গুলী শুধু রূপবতী নন্, বুদ্ধিমতীও বটে।

বল্‌লাম, পুলিশ কেস্ আরম্ভ করার মঁত যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাইনি বলেই ত এই দুর্ভোগ। তবে যেটুকু পেয়েছি তাতেই আপনার প্রতিষ্ঠানকে অনেক জবাবদিহি কর্‌তে হবে।

—যত খুসী প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দেবার চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু আমার বক্তব্য না শুনেই একতরফা অর্ডার, এটা কি সঙ্গত হয়েছে?

—আপনার বক্তব্য শোন্‌বার জন্যই ত আপনাকে আস্‌তে বলেছি। কি বল্‌তে চান্ বলুন।

—আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কি চার্জ সেটা আগে বলুন!

—কেন, আমাদের অফিসার কি আপনাকে এবং আপনার সহকারীদের কোনো প্রশ্ন করেনি? গত দু'বছর ধরে আপনারা যে লোহা পেয়েছেন তা' কোথায় কি ভাবে ব্যবহার করেছেন তার একটা সন্তোষজনক ইতিবৃত্ত দিতে পেরেছেন কি?

অসহিষ্ণুভাবে শ্রীমতী গাঙ্গুলী জবাব দিলেন, ইতিবৃত্ত নিশ্চয়ই দিয়েছি, তবে আপনাদের তাতে যদি সন্তুষ্টি না আসে তা হ'লে আমরা নিতান্ত নিরুপায়।

আমি হেসে বল্‌লাম, যে ইতিবৃত্ত আপনারা দিয়েছেন তা আমি দেখেছি। আর কিছু বল্‌বেন কি? আমি ত ভেবেছিলাম আপনি নতুন কিছু বল্‌তে এসেছেন।

শ্রীমতী গাঙ্গুলী অনুনয়ের ভঙ্গীতে বল্‌লেন, আমাকে অযথা এমন ভাবে বিব্রত কর্‌ছেন কেন, ডাঃ দাস? কি আপনার অভিপ্রায়? কি চান্ আপনি?

বিলোল কটাক্ষে শ্রীমতী গাঙ্গুলী তাকালেন আমার দিকে। স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে রূপবতী রমণীর অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন তিনি।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, তাঁর অতুলনীয় বাক্‌পটুতায় আমিও সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান্ অবস্থায় এসে পড়েছিলাম, কিন্তু এই শেষ ইঙ্গিতে সচেতন হয়ে উঠলাম।

বল্‌লাম, অভিপ্রায়? অভিপ্রায় খুবই সরল। কর্তব্যের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজ আমাকে কর্‌তে হয়, আপনাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও তাই করতে হয়েছে। আমি চাই আপনার সহযোগিতা, কিন্তু যদি তা' দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে চাই খানিকটা ধৈর্য। বিশ্বাস করুন্, যদি দেখি আমার ভুল হয়েছে, আমি নিজে আপনার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আস্‌ব।...তবে আশা কর্‌ছি তার প্রয়োজন হবে না।

শ্রীমতী গাঙ্গুলী এবার অন্য সুর ধর্‌লেন। ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একটা রুমাল বার করে উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতে বল্‌লেন, আপনি জানেন না—কি প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমাকে এই ব্যবসায় চালাতে চাচ্ছে। স্বামী মারা যাবার পর আমাদের একমাত্র সন্তানকে মানুষ করে তোল্‌বার দায়িত্ব পড়েছে সম্পূর্ণ আমার উপর। ভেবেছিলাম, আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা আপনাকে বল্‌ব না, কিন্তু না বলে পার্‌লাম না। সন্তানের কল্যাণের জন্য যদি কোন অন্যায় করেও থাকি (অবশ্য আমি তা' দৃঢ়ভাবে অস্বীকার

করছি), ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবেন না।...আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, ডাঃ দাস।

আমি হেসে বল্লাম, তাহ'লে ত কোন ভাবনাই নেই আপনার। ভগবানে যখন আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনি যখন কোন অন্যায় করেন্নি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাক্তে পারেন আপনার প্রতি যারা অবিচার কর্ছে ভগবান্ তাদেরই শাস্তিবিধান করবেন সকলের আগে।...এখন যে এই সাময়িক অসুবিধায় পড়েছেন এটা হচ্ছে ভগবানের পরীক্ষা, তিনি হয়ত দেখছেন বিপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁর প্রতি আপনার বিশ্বাস অটুট থাক্ছে কিনা!

শ্রীমতী গাঙ্গুলী খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। আমি যা বল্লাম তার মধ্যে কতখানি শ্লেষ মেশানো আছে তা উপলব্ধি কর্তে বোধ হয় চেষ্টা কর্লেন!

তারপর মোহিনী এক হাসি হেসে বল্লেন, আপনার ক্ষমা ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, ডাঃ দাস। কিন্তু এ বাদেও যদি কোন সময় আমার সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করেন, আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাবেন। আপনার প্রয়োজনে আস্তে পার্লে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব।

ব'লে আমাকে প্রত্যুত্তরের কোন অবকাশ না দিয়েই ছোট্ট একটি নমস্কার করে শ্রীমতী গাঙ্গুলী বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীমতী গাঙ্গুলীর সঙ্গে এই বিচিত্র সংলাপের কাহিনী আমার গৃহিণীকে বলেছিলাম মাস কয়েক পরে।

গৃহিণী সন্দিগ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কখনও যাওনি ওঁর বাড়িতে? ক্ষমা চাইতেও নয়?

আমি জবাব দিয়েছিলাম, ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন হয়নি, কারণ অপরাধের পরিপূর্ণ প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। তবে, হ্যাঁ, সহযোগিতার আহ্বান আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল বই কি! যদি আমি এই পোড়া দপ্তরের সচিবের পদ অধিকার ক'রে

না থাকতাম তাহ'লে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম কিনা কে জানে ?

আজ পর্যন্ত আমার গৃহিণী বিশ্বাস করেন না যে শ্রীমতী গাঙ্গুলীর মধুরিমায় আমি অভিভূত হইনি।

আপনারা কি বলেন ?

চৌদ্দ

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন—ডাঃ দাস, দুর্নীতিদমন বিভাগে যে এক বছর আপনি সচিব ছিলেন সে সময়ে সবচেয়ে sensational কি কেস্ আপনাকে তদন্ত কর্‌তে হয়েছিল ?

এ জাতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ sensationalism সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমি কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি কেস্-এই খানিকটা নতুনত্ব, খানিকটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছিলাম। সেজন্যই বোধ হয় এত কেস্ তদন্ত কর্‌তে গিয়েও কোন প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিনি।

১৯৫৮ সালের বাংলা খবরের কাগজ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অবশ্য জানেন কোন্ কেস্‌টা বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্য এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। খবরের কাগজে যা' প্রকাশিত হয়েছিল তার সবটা অবশ্য সত্যি নয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে, সত্যের সঙ্গে "নিজস্ব সংবাদদাতা"দের কল্পনাও খানিকটা মেশানো ছিল। তবে যে ব্যাপক দুর্নীতি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলাম তা' মোটেই মন-গড়া নয়। কয়েকজন পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে ভুল খবর প্রকাশিত হলেও অধিনায়কদের modus operandi বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ ছিল না।

যদিও মাত্র একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগের

ভিত্তিতে কেস্‌টি সুরু হয়েছিল, কিছুদিন পরেই তার সুদূরপ্রসারী ব্যাপকত্ব আমার নজরে আসে। আমি দেখতে পাই যে অভিযুক্ত কর্ম্মচারীটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ হাকিম এবং অধিকর্তা-শ্রেণীর লোক। জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে।

কেস্‌টা আমার নজরে আসে অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে। একজন পাঞ্জাবী বাস্‌-ড্রাইভার এসে আমাকে জানায় যে শ্রীযুত রায়কে সে কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিল, এই প্রতিশ্রুতিতে যে তাকে একটা বিশেষ routeএর বাস্‌এর permit জোগাড় করে দেওয়া হবে। লাইসেন্স এবং পারমিট দেবার অধিকর্তাদের সঙ্গে শ্রীযুত রায়ের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের খবর অনেকেই জান্‌ত, কাজেই পাঞ্জাবী বাস্‌-ড্রাইভারটির মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু যখন ছয়, সাত, আট মাস কেটে গেল এবং দেখা গেল যে permit দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ আরেকজনকে, তখন তার টনক নড়ল। শ্রীযুত রায়ের কাছ থেকে সে টাকা ফেরৎ চাইল, কিন্তু ফেরৎ পেল না। বরং তাকে শাসান হ'ল—সে যদি এই বিষয় নিয়ে হৈ-হল্লা করে, তার নামে পাল্‌টা নালিশ করা হবে এই মর্মে যে, সে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছে। অনন্যোপায় হয়ে বাস্‌ ড্রাইভারটি এল আমার দপ্তরে।

ঘুষ দেওয়া সত্ত্বেও অভীষ্টসিদ্ধি না হ'বার অনেক উদাহরণই এর আগে আমার নজরে এসেছে, কাজেই সুচেৎ সিংএর কাহিনী শুনে আমি মোটেই আশ্চর্যবোধ কর্‌লাম না। কিন্তু শ্রীযুত রায় যে তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন তার প্রমাণ কোথায়? তিনি ত অনায়াসেই বল্‌তে পারেন যে permit দেবার সঙ্গে তাঁর কোনই সংশ্রব নেই, কাজেই ঘুষ চাইবার বা নেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পরে যখন ব্যাপক তদন্ত সুরু হয়, তখন শ্রীযুত রায় এই defenceই উপস্থাপিত করেছিলেন।

আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেয়ে সুচেৎ সিং

বল্‌ল, আমি একা নয়, স্যার। আমার মত আরও অনেকে এই প্রকার ঘুষ দিয়েছে। কারো অভীষ্টই যে সফল হয়নি' এমন কথা বল্‌ব না, তবে শ্রীযুত রায় এ ভাবে অনেককে ঠকিয়েছেন।

—তাদের দু'একজনকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌তে পারেন?

একটু চিন্তা করে সুচেং সিং বল্‌ল—চেষ্টা কর্‌তে পারি, স্যার। তবে বুঝতেই ত পার্‌ছেন, ঘুষ দেওয়াটাই ত কম অপরাধ নয়, অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চাইবে না!

বিরক্ত হয়ে আমি জবাব দিলাম, তাহ'লে আমি নিরুপায়। অপরের অন্যায়ের প্রতিকার যদি চান, তাহ'লে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করবার মত সৎসাহস আপনাদের থাকা উচিত। আপনার একার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আমি তদন্ত সুরু করতে রাজী নই। অন্ততঃ আর দু'চারজনের কাছ থেকে corrboration পেতে চাই।

—আমি কি তাদের বল্‌তে পারি স্যার, যে তাদের নাম-ধাম বাইরে প্রকাশিত হবে না?

—এ রকম blank প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না। তদন্তের ফলে যদি action নিতে হয় তাহ'লে তাদের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে বই কি! তবে আপাততঃ, অর্থাৎ তদন্তাধীন সময়টায়, তাদের নাম-ধাম যথাসম্ভব গোপন রাখব এই আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি।

পনেরো

দিন সাতেক পরে সুচেৎ সিং টেলিফোন করে জানাল যে সে আরও কয়েকজন উৎকোচদাতার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আমার দপ্তরে এসে তারা তাদের বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছে!

তিনজন লোককে সঙ্গে করে সুচেৎ সিং আমার দপ্তরে এসে হাজির হ'ল। তাদের মধ্যে একজন দোকানদার, একজন স্কুলের শিক্ষক এবং তৃতীয়টি পুলিশেরই একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর।

তিন জনের কাহিনী পৃথক ভাবে শুন্‌লাম। অতি অদ্ভুত কাহিনী, যা শুনলে সত্যি মনে হয় truth is stranger than fiction.

শ্রীযুত রায়ের লোক ঠকাবার ক্ষমতা অলৌকিক বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। Modus operandi মোটামুটি এই ঃ জনসাধারণ দেখতে পায় তাঁর সঙ্গে সরকারের বড় বড় কর্মচারীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সরকারের কাছে লোকের প্রার্থনার অন্ত নেই, প্রার্থীরা আসে শ্রীযুত রায়ের কাছে, তিনি তাদের ভরসা দেন—ভয় কি, তোমাদের যা' প্রয়োজন আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। অবশ্য কিছু টাকা খরচ করতে হবে বুঝতেই ত পারছ, বড়লোকদের নজরটাও উঁচু, হাজার কয়েকের কমে হবে না!

এই ভাবে শ্রীযুত রায় দোকানদারটির কাছ থেকে আদায় করেছিলেন হাজার তিনেক টাকা, তাকে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট এর অনুমোদিত এজেণ্টের লিষ্টএ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতিতে। স্কুলের শিক্ষকটির প্রার্থনা ছিল সরকারী দপ্তরে একটা চাকুরী, দর্শনী দিয়েছিল পাঁচশ' টাকা। আর পুলিশের এসিষ্ট্যাণ্ট-সাব্‌ইন্সপেক্টরের আর্জি ছিল, তার বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত চলেছে তা' যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুলিসের এসিষ্ট্যাণ্ট-সাব্‌ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি শ্রীযুত রায়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লেন কেন? আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত সম্বন্ধে উনি কি করবেন?

লজ্জিত জবাব এল, আমাদের সুযোগ কোথায় স্যার, যে খোদ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সামনে আর্জি পেশ করি? তাছাড়া, সত্যি কথা বল্‌তে কি, যে বিষয় নিয়ে তদন্ত চলেছে তাতে আমি একেবারে নিরপরাধও নই। তাই ভাব্‌লাম, শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এত গলাগলি ভাব, আমার হয়ে উনি যদি কিছু সুরাহা কর্‌তে পারেন!

—আপনি শ্রীযুত রায়কে টাকা দিয়েছেন ?

—আজ্ঞে না, এখনও দিইনি। তবে ওঁকে বলেছি যে তদন্তটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধাবোধ কর্‌ব না।

এদের বিবৃতি থেকে যদিও বোঝা গেল যে শ্রীযুত রায় সত্যমিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকেন, এমন কোন প্রমাণ এরা দিতে পার্‌ল না যে যাঁদের নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে তাঁরাও এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট।

গোপনে তদন্ত সুরু করলাম। আমার অফিসারদের ডেকে বল্‌লাম, ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে! যাঁদের নাম ক'রে শ্রীযুত রায় টাকা আদায় করেন তাঁরাও অংশীদার কিনা জানতে চাই। আর অংশীদার যদি নাই হয়ে থাকেন তাহলে শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে তাঁদের এই গভীর সৌহার্দ্যের হেতুটা কি? সরকারীভাবে শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক খুবই সামান্য, অথচ সবাই বলে তিনি এঁদের একজন বিশেষ বন্ধু!

এই বড় বড় কর্মচারীদের উপর শ্রীযুত রায়ের প্রভাবের গূঢ় কারণটা তদন্তের ফলে জানতে পেরেছিলাম। প্রত্যেক মানুষেরই একটা-না-একটা দুর্বলতা আছে, যদিও তা' সব সময় বাইরে প্রকাশ পায় না। শ্রীযুত রায় প্রথমেই খোঁজ নিতেন তাঁর সরকারী "বন্ধুদের" দুর্বলতা কি এবং কোথায়। তারপর সেই দুর্বলতায় জোগাতেন ইন্ধন।

এই ইন্ধন জোগাবার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অস্বাভাবিক। যাঁরা প্রয়োজনটা মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন তাঁদের অভীপ্সা তিনি বুঝে নিতেন পলকের মধ্যে, তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন কি করে তা' চরিতার্থ করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম যেদিন শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় আমিও তাঁর সৌজন্যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তায়, তাঁর বাক্‌পটুতায় চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, যাঁদের প্রয়োজন মেটাতে তিনি সাহায্য করতেন তাঁরা হয়ে থাকতেন কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ। এই কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তাঁরা খুবই চেষ্টা করতেন শ্রীযুত রায়ের নানা অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করতে।··· দয়ারাম বসুর লাইসেন্স মঞ্জুর করতে হবে? নিশ্চয়ই, মিঃ রায়, আমি খুব চেষ্টা করব।···কি বললেন, সমরেশবাবুর ফাইলটা এখনও আমার দপ্তরে চাপা পড়ে রয়েছে? কি অন্যায়, বলুন ত! আমি আজই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।···চাকলাদারের বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত সুরু হয়েছে তা' বন্ধ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? এটা হয়ত সম্ভবপর হবেনা, তবে আমি দেখব কতদূর কি করতে পারি।

সুচেৎ সিং-এর সঙ্গে যে তিনজন আমার দপ্তরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের বিবৃতি শুনে আমি চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কিভাবে শ্রীযুত রায় তাঁর হাকিম এবং অধিকর্তা-বন্ধুদের অনুরোধ জানান্ এবং কি ভাবে তাঁরা react করেন।

ষোলো

শ্রীযুত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তদন্ত করবার ফলে উদ্ঘাটিত হ'ল আর এক বিরাট উপন্যাস। জানা গেল, শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে অনেক তরুণীর পরিচয় এবং হাকিম-অধিকর্তা-বন্ধুদের সঙ্গে এদের মেশবার সুযোগ, সুবিধা এবং ব্যবস্থা করে দিতে তিনি অতি কলাকুশলী।

আরও জানা গেল—অধিকাংশ এইসব তরুণী বাস্তহারা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে, নিতান্তই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। কোথায় এদের গতিবিধি তা' ও আমাদের জানতে বাকী রইল না।

আমার দু'জন বিশ্বস্ত অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হ'ল যে—যে হোটেলে এরা সাধারণতঃ মিলিত হয় সেখানে আমরা surprise raid করব।

সে রাতটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমার মনে পড়ছে। আমার অফিসারদের পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁদের অভিযানে, আর আমি বসে আছি আমার হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট-এর দপ্তরে। গোটা দুই paperback উপন্যাস সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তারই একটার পাতা ওল্‌টাচ্ছি, কিন্তু আমার নজর সব সময় টেলিফোনটার ওপর।

রাত তখন সাড়ে দশটা। টেলিফোন বেজে উঠল। সাগ্রহে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

—অভিযান খানিকটা জয়যুক্ত হয়েছে, স্যার।···অপর প্রান্ত থেকে খবর এল।

—খানিকটা? সে আবার কি?

—তিনটি মেয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু শ্রীযুত রায় আজ আসেন নি, কাজেই বুঝতে পারছিনা আমাদের কেস্‌এর সঙ্গে এই মেয়ে তিনটির কোন সংশ্রব আছে কিনা। আপনার কাছে এদের নিয়ে আস্‌ব কি?

হাতের বইটার দিকে তাকালাম। অন্যের লেখা গল্প ত কম পড়িনি, শোনাই যাক্ না বাস্তব জীবনের দু'একটা কাহিনী।

বল্‌লাম, হ্যাঁ, নিয়ে আসুন।

তিনটি মেয়েই বাঙালী, বয়স সতেরো আঠারো থেকে কুড়ি একুশের মধ্যে। দু'জনের সিঁথিতে সিন্দুর, তৃতীয়া অনূঢ়া। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তারা এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াল।

ইসারা করে আমার অফিসারদের বাইরে যেতে বল্‌লাম। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তাঁদের সাম্‌নে অনেকেই মুখ খুলতে রাজী হয়না, কারণ তাঁরা হচ্ছেন দয়ামায়াবর্জিত পুলিশ-কর্মচারী। কিন্তু আমি দুর্নীতি দমন বিভাগের সচিব, ডাঃ দাস, হচ্ছি সিভিলিয়ান্। শুধু তাই নয়, সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক বলে আমার খানিকটা খ্যাতিও আছে। যে দরদ, যে সমবেদনা দিয়ে আমি তাদের বিবৃতি শুনব, তা' তারা পুলিশের কর্মচারীর কাছ থেকে সাধারণতঃ আশা করতে পারে না!

তিনজনের মুখপাত্র হিসেবে যে মেয়েটি কথা বল্‌তে রাজী হ'ল তার নাম দিচ্ছি অণিমা।

আমি প্রশ্ন করলাম, এত রাতে ঐ হোটেলে তোমরা কি করছিলে?

ঢোক গিলে অণিমা জবাব দিল, খেতে এসেছিলাম।

—খেতে এসেছিলে? একা? কে তোমাদের নেমতন্ন করেছিল? যতদূর জানি, ঐ হোটেলে তো বাইরের লোকদের খেতে দেওয়া হয়না!

এখানে বলা দরকার, হোটেলটা কোন কুখ্যাত পাড়ায় নয়, ভদ্র—সার্কুলার রোডএর উপর।

—এক ভদ্রলোক ওখানে থাকেন, তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

—কে এই ভদ্রলোক? তাঁর নাম?

ঘাড় নেড়ে অণিমা জবাব দিল যে নাম সে জানে না।

—অতি চমৎকার ব্যবস্থা ত! ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত জান না, অথচ তাঁর অতিথি হিসেবে তোমরা এই হোটেলে খেতে এসেছিলে?

অণিমা নীরব।

আমি বল্‌লাম, দেখ, তোমাদের অযথা বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু জান্‌তে চাই, কার নির্দেশে তোমরা এই হোটেলে এসেছিলে। আর জান্‌তে চাই, এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার কোন আয়োজন ছিল কিনা। চটপট সত্যি কথা বলে ফেলো, তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি।

অনেক জেরার পর যা বেরুল তা' মোটামুটি এই। তাদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একজন স্বামী পরিত্যক্তা, অপর জনের স্বামী অসুস্থ, বেকার। তৃতীয়ার বাড়ির অবস্থাও ভাল নয়, বৃদ্ধ বাপ হাঁপানি রোগে ভুগছে, ছোট ভাইটি এক মোটর গ্যারেজে গাড়ী ধোয়ার সামান্য কাজ করে। সংসার কিছুতেই চলে না, তাই এই

ভদ্রলোক এসে যখন অর্থোপার্জ্জনের এই নতুন পথ বাৎলে দিলেন তখন অনন্যোপায় হয়ে তারা রাজি হ'ল। হ্যাঁ, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা জানে বৈ কি, অন্ততঃ বুঝতে নিশ্চয়ই পারে, কোথায় তারা যায়, সংসার খরচের টাকা কি ভাবে আসে।…এই হোটেলেই তারা সাধারণতঃ মিলিত হয়, তারপর এখান থেকে ভদ্রলোকটি তাদের নিয়ে যান, কখনও কোন ফ্ল্যাটএ, কখনও কল্‌কাতার বাইরে কোন বাগান-বাড়ীতে। গত এক বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলেছে। এ পর্যন্ত কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি, আজ নিশ্চয়ই তারা অশুভ মুহূর্তে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, নতুবা পুলিশের হাতে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত না।…না, ভদ্রলোকটি আজ আদৌ আসেন্ নি।

—ওঁকে যদি তোমাদের সামনে এনে হাজির করা হয়, সনাক্ত করতে পারবে ত?

তিন জনেই ঘাড় নেড়ে জানাল, নিশ্চয় পারব।

—যে সব জায়গায় তোমরা এতদিন গিয়েছ সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পার? এই সব ফ্ল্যাট বা বাগান-বাড়ীর বাসিন্দা কারা?

এ বিষয়ে তারা বিশেষ কিছু বল্‌তে পারল না, কারণ তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ত ট্যাক্সি ক'রে এবং বাড়িতে পৌঁছেও দেওয়া হত ঐ ভাবে। তবে যাদের শয্যাসঙ্গিনী তারা হয়েছে তাঁরা সবাই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ অফিসার হওয়াও অসম্ভব নয়।

পরে ভদ্রলোকটিকে তারা অনায়াসে সনাক্ত করতে পেরেছিল। ভদ্রলোকটি আর কেউ নয়, আমাদের শ্রীযুত রায়।

বাংলা দেশের বুকের ওপর এই যে বিরাট ব্যভিচার চলেছে তার একটু-আধটু আভাস এর আগেও পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যভিচার যে এতখানি ব্যাপক এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এর সঙ্গে এমনভাবে জড়িত তা' আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, যদি এই কেস্ আমাকে তদন্ত করতে না হ'ত।

সতেরো

তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আমার রিপোর্ট লিখছি, এমন সময় আমার সহকারী এসে খবর দিলেন, কাকলি দেবীকে নিয়ে এসেছি, স্যার।

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম, কাকলি দেবী? তিনি আবার কে?

—আমাদের এই কেস্‌এর অন্যতম নায়িকা, স্যার। শ্রীযুত রায়ের গাড়ীর ড্রাইভার যার কথা বলেছিল।

এবার মনে পড়ল। শ্রীযুত রায়ের গাড়ীর ড্রাইভারকে জেরা করে আমরা জেনেছিলাম, বাংলা রূপমঞ্চের উদীয়মতী নায়িকা কাকলি দেবী ছিলেন চিত্তবিনোদনকারিণীদের অন্যতমা। কিন্তু আমার দপ্তরে তাঁকে টেনে নিয়ে আসবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাইনি', তাই তাঁকে বাদ দিয়েই তদন্তের সমাপ্তি করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রশ্ন করলাম, কি অজুহাতে ওঁকে নিয়ে এলেন?

একটু হেসে আমার সহকারী জবাব দিলেন, অজুহাত একটা দিতে হয়েছে বই কি স্যার। আমি নিজে আজ ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, বল্‌তে যে রূপালী পর্দায় আপনি ওঁর অভিনয় দেখে ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাকলী দেবী কি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন?

—আপনারা ত অত্যন্ত dangerous লোক দেখছি। কোন্‌ দিন আমারই বিরুদ্ধে হয়ত একটা charge আস্‌বে যে আমি কাকলি দেবীকে seduce করবার চেষ্টা করছি!

—না স্যার, সবাই জানে আপনি এসবের উর্ধ্বে। তাছাড়া, seduce করাবার স্থান এবং সময় আছে ত! হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট এবং

বেলা বারোটা নিশ্চয়ই প্রশস্ত স্থান এবং সময় নয়।...কাকলি দেবীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

আমি এসব দুর্বলতার উর্ধ্বে এমন অহমিকা আমার নেই। তাই সভয়ে প্রশ্ন করলাম, একা? আপনি উপস্থিত থাক্‌বেন না?

আবার একটু হাস্‌লেন আমার সহকারী। বল্‌লেন, আমি উপস্থিত থাক্‌লে উনি হয়ত অনেক কিছু গোপন করে যাবেন। আমাদের কেস্‌এর সাফল্যের জন্য আপনাকে এটুকু করতেই হবে স্যার।

কেসএর সাফল্য চুলোয় যাক, কাকলিদেবীকে দেখবার এবং তাঁর সঙ্গে বাক্য বিনিময় কর্‌বার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল। বল্‌লাম, তথাস্তু।

মিনিট পাঁচেক বাদে পর্দার বাইরে কাকলিদেবীর কাকলি শুনতে পেলাম, ভেতরে আসতে পারি?

জবাব দিলাম, নিশ্চয়, চলে আসুন।

ছোট্ট একটি নমস্কার করে কাকলি দেবী আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বস্‌তে বললাম।

রূপালী পর্দায় যে ছবি আমরা দেখি, তার সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্য অনেক সময়ই দেখতে পাওয়া যায় না। কাকলিদেবীর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম নজরেই অনুভব করলাম! দেখলাম, বিধাতা তাঁর উপঢৌকন বিতরণ করতে কোন দিক দিয়েই কার্পণ্য করেন নি'। পাতলা দোহারা-চেহারা, টানাটানা চোখ, গায়ের রং দুধে-আল্‌তায় উজ্জ্বল, এক কথায় বল্‌তে গেলে অসামান্যা রূপসী।

এতটুকু সঙ্কোচ না ক'রে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে কাকলি দেবী প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

অতর্কিত এই আক্রমণে আমি বোবা হ'য়ে বসে রইলাম।

আমার সহকারীর নাম উল্লেখ ক'রে কাকলি দেবী বলে চল্‌লেন, উনি আমার ওখানে গিয়ে বললেন যে, কি এক গোপনীয় ব্যাপারে

আপনি আমার সাহায্য চান্। আমি অবশ্য আপনার নাম অনেক আগেই শুনেছি, ভাবলাম এই সুযোগে আপনার সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে, তাই চলে এলাম।

বলে মধুর এক হাসি হাস্‌লেন তিনি।

মোহগ্রস্ত ভাবটাকে সজোরে ঝাড়া দিয়ে এবার বল্‌লাম, সুযোগটা পেয়ে আমিও খুসী হয়েছি কাকলি দেবী।···ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, খবরের কাগজে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন শ্রীযুত রায়ের কীর্তিকাহিনী নিয়ে একটা বিরাট তদন্ত চলেছে—আমারই নির্দেশে।

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে কাকলি দেবী বল্‌লেন, হ্যাঁ, খানিকটা দেখেছি বই কি। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারি?

—অনেকভাবেই সাহায্য করতে পারেন, কাকলি দেবী। প্রথম সাহায্য করতে পারেন আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিয়ে, কোন কিছু গোপন না রেখে।

—আগে বলুন, কি আপনার প্রশ্ন?

—প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়? কি জাতীয় সম্প্রীতি?

—শ্রীযুত রায়? হ্যাঁ, তিনি ত মাঝে মাঝেই আমাদের ষ্টুডিয়োতে আসেন। ডিরেক্টারের সঙ্গে ওঁর অনেক দিনের জানাশুনো। আমার সঙ্গে কতদিনের পরিচয়? তা' বছর দেড় দুই হবে। তবে পরিচয়টা ঐ ষ্টুডিয়ো অবধি।

—এবার যে প্রশ্ন করব আপনি রাগ করবেন না। শ্রীযুত রায়ের সঙ্গে বা তাঁর নির্দেশে আপনি কখনও সুনামগঞ্জের বাগান-বাড়ীতে গিয়েছিলেন কি?

কাকলি দেবী সত্যি রাগ করলেন। চোখ-মুখ লাল ক'রে বল্‌লেন, তার মানে? এমন অভদ্রোচিত প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আশা করিনি, ডাঃ দাস।

আমি বললাম, অভদ্রতা কোথায় দেখলেন কাকলি দেবী? আমি ত আর কিছুই বলিনি, শুধু জিজ্ঞাসা করেছি—আপনি কখনও সুনামগঞ্জের বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন কিনা।···প্রশ্নটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়, কারণ আমরা শ্রীযুত রায়ের ড্রাইভারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, আপনি একাধিকবার ঐ বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন।

ভয়ের একটা ছায়া যেন কাকলি দেবীর মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপর স্থির অকম্পিত-কণ্ঠে বললেন, শ্রীযুত রায়ের ড্রাইভার যদি আমার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলে তাহলে তার জন্য কি দায়ী আমি?

—কিন্তু আপনার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলায় তার কি লাভ?

অসহিষ্ণুভাবে কাকলি দেবী বল্‌লেন, আমি তা' কি ক'রে বলব? তবে আমার অনুরোধ, অনুরোধ কেন, দাবী—যে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্বন্ধে সামান্য এক ড্রাইভারের এ জাতীয় উক্তি আপনাদের কানে নেওয়াও অনুচিত।

—যদি বলি শুধু ড্রাইভার নয়, বাগানবাড়ীর দারোয়ান্‌ও আপনাকে দেখেছে?

যেন হোঁচট খেলেন কাকলি দেবী। তবু বল্‌লেন, দারোয়ান্? মিথ্যে কথা।

আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম আমি। বল্‌লাম, তারা আপনাকে সনাক্ত করতে প্রস্তুত আছে, কাকলি দেবী।

এবার কাকলি দেবী সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। বল্‌লেন, আপনি বুঝি তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আপানার কাছ থেকে অন্য রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলাম, ডাঃ দাস!

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, এখ্‌খুনি চলে যাবেন না। আপনার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আপনাকে এখানে এক মিনিটও আটকে রাখা হবে না।···
আমি শুধু অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আপনার নামধাম আমরা সম্পূর্ণ গোপন রাখব, কারণ আমাদের লক্ষ্য আপনি নন্, আমাদের লক্ষ্য শ্রীযুত রায় এবং তাঁর ক্ষমতাশালী বন্ধুর দল।

—আমাকে এতটা ছেলেমানুষ মনে করবেন না, ডাঃ দাস। আপনার এই প্রতিশ্রুতির কোনই মূল্য নেই, কারণ তদন্ত যখন শেষ হবে তখন প্রয়োজন বোধ করলে আপনি আমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করবেন না।

—তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি সুনামগঞ্জের বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন ?

—মোটেই না।···আমি আবার বলছি, আপনার ড্রাইভার এবং দারোয়ান ভুল দেখেছে, সুনামগঞ্জ জায়গাটা কোথায় তা'ও আমি জানি না।

তারপর একটু থেমে গভীরভাবে কাকলি দেবী বল্‌লেন, আচ্ছা, আপনি ত লেখক, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, বোঝেন। আমাকে দেখে কি মনে হয়, যার তার বাগানবাড়ীতে যাওয়া আমার অভ্যাস ? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি জবাব দিন, ডাঃ দাস।

বলে কাকলিদেবী তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার ডান হাতটা স্পর্শ কর্‌লেন।

রক্তমাংসের মানুষ আমি। বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল আমার শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে। জবাব দিতে বাধ্য হলাম, আপনার অস্বীকৃতি মেনে নিলাম, কাকলিদেবী।···আমি আবার এসম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্‌ব। যদি দেখি আমাদেরই ভুল হয়েছে, আমি নিজে আপনার বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে আস্‌ব।

—আসবেন ত ? কথা দিলেন কিন্তু!···উজ্জ্বল চোখে, উচ্ছল ঠোঁটে কাকলিদেবী বল্‌লেন।

এরপর দেড় বছর কেটে গেছে। কাকলিদেবীর বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা আমাকে কর্‌তে হয়নি, কারণ আরও অনেক প্রমাণ তখন আমরা পেয়েছিলাম, যার ফলে এই ব্যাপারে কাকলিদেবীর role সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, যতদূর জানি, কাকলিদেবীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

আমার এই স্মৃতিকাহিনী কাকলিদেবীর নজরে পড়্‌বে কি না জানিনা। যদি পড়ে, তাহ'লে তাঁকে জানাচ্ছি যে আমি কল্‌কাতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। উনি যদি কখনও আরবসাগরের এই প্রান্তে পায়ের ধূলো দেন্, আমাকে যেন টেলিফোন্ করেন। তাঁর সঙ্গে আমার ক্ষণিক পরিচয় পুনরুজ্জীবিত কর্‌বার সুযোগ পেলে আমি সত্যি খুসী হ'ব।···না, কোন প্রকার জেরা কর্‌বনা, আমি সাক্ষাতে তাঁকে শুধু বল্‌তে চাই যে আমি এখনও তাঁর একজন মুগ্ধ ভক্ত।

আঠারো

কাকলিদেবীর কাহিনী বল্‌তে গিয়ে মনে পড়ছে আরেকজনের কথা। তাঁর নাম দেওয়া যাক্ সুনয়নী দেবী।

দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন কেস-এর সঙ্গে সুনয়নী দেবীর সংশ্রব ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বল্‌তে গেলে কাকলি দেবীরই মাধ্যমে, অথবা অনুগ্রহে।

খুলে বল্‌ছি।

১৯৫৮ সালের শেষার্ধ। আই-সি-এস্ থেকে আমার পদত্যাগের আবেদন-পত্র সরকার গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে সেই মর্মে জানিয়েও গিয়েছেন। ঠিক কোন্ তারিখে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে শুধু সেটাই স্থির হওয়া বাকী।

ঠিক এই সময়ে একদিন আফিসে এসে দেখি আমার টেবিলের উপর একখানা নীলখাম পড়ে আছে। মেয়েলি হাতে বিশুদ্ধ

বাংলায় আমার নাম লেখা, আর বাঁদিকে লাল কালিতে লেখা ঃ "বিশেষ জরুরী।"

চাপরাসীকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এ চিঠি কে দিয়ে গেল ?

জবাব পেলাম, শাদা হিন্দুস্থান অ্যামবাসাডার গাড়ীতে চড়ে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, প্রথমেই খোঁজ করেছিলেন, আমি অফিসে আছি কি না। যখন শুন্‌লেন যে আমি নেই—তখন তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে দোতলায় চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ড্রাইভার বিশেষ করে বলে গেছে, সাহেব এলেই যেন চিঠিখানা তাঁকে দেওয়া হয়।

বিস্মিতভাবে খামটা খুললাম। প্রথমেই লেখিকার নাম পড়লাম—সুনয়নী দেবী।...এঁকে ত চিনি বলে মনে হচ্ছে না!

চিঠিটা এই ঃ

"শ্রদ্ধাস্পদেষু ডাঃ দাস,

আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। কাকলির কাছে আপনার কথা শুনেছি। তারপর খবরের কাগজের মারফৎ জান্‌তে পারলাম আপনি আমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রে সুদূর বম্বে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছি আমরা বাংলাদেশের নরনারীর দল? আপনার দপ্তরের অনুসন্ধানে আমরা যথোপযুক্ত সহায়তা করিনি' বলেই কি আপনার এই অভিমান? তাহ'লে কাকলির হয়ে আমিও আপনাকে বল্‌ছি, আপনার কাছ থেকে কিছুই গোপন করা হয়নি. নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাকলি মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি।

তবে হ্যাঁ, আপনার অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নয়। যে কেস্ সম্পর্কে আপনি কাকলিকে শমন করেছিলেন তা' বাদে আরও অনেক কেস্ আছে—যাতে কাকলি বা তার সমধর্মী অনেক মেয়ে জড়িয়ে রয়েছে। শুনেছি সে সব আপনার আওতায় আসে না, কারণ সরকারী দুর্নীতির সঙ্গে এদের কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব নেই। কিন্তু আমার মতে সরকারের এসব বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি আপনাকে অনেক খবর

দিতে পারি, শোন্‌বার সময় হবে কি ? আপনি ত আজ বাদে কাল চলে যাচ্ছেন, আমার দেওয়া খবর আপনার দপ্তরের কাজে হয়ত লাগবে না, তবে আপনি লেখক, আপনার লেখার সাহায্য হ'তেও বা পারে।

অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আমার নেই, তাই চিঠিটা বাড়ি থেকেই তৈরী করে এনেছিলাম। আমার ড্রাইভার নিজে আপনার চাপরাশীর হাতে দিয়ে যাবে। আপনি উপরের টেলিফোন নম্বরে অবসর মত টেলিফোন করবেন, তখন অন্যান্য কথা হ'বে।

গুণমুগ্ধা

সুনয়নী দেবী

টেলিফোন নম্বরটা লেখা রয়েছে, কিন্তু কোন ঠিকানা সুনয়নী দেবী দেন্‌নি।

চিঠিটা পড়ে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল নির্জলা দুঃখ, এইজন্য যে আমি আর কয়েক হপ্তার মধ্যেই এই বিচিত্র দপ্তরের পরিধির বাইরে চলে যাচ্ছি! দুর্নীতি দমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছি বলেই না কাকলি দেবী সুনয়নী দেবীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। শুধু ডাঃ নবগোপাল দাসের এরকম চিঠি পাবার সৌভাগ্য হবে কি ?

দুঃখ করে কোন লাভ নাই : the die has been cast. স্থির করলাম, সুনয়নী দেবীর সঙ্গে পরিচয়টা আমার exclusive থাকুক, দপ্তরের কাউকে এসম্বন্ধে কিছু বলব না, অন্ততঃ এখন নয়।

টেলিফোনের নম্বরটা ডায়াল কর্‌লাম।

অপর প্রান্তে সুনয়নী দেবী বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। "সুনয়নী দেবীর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?" বলতেই মেয়েলিকণ্ঠে জবাব এল, "আমি সুনয়নী দেবী বলছি। আপনি কি ডাঃ দাস ?"

—হ্যাঁ, হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে বলছি।

—আমার চিঠিটা পড়েছেন আশা করি।

—নিশ্চয়ই পড়েছি, নইলে টেলিফোন করছি কি করে?

—আপনি একবার আস্‌তে পারেন কি? যে কোন সময়, আপনার সুবিধামত। একা আস্‌বেন কিন্তু, আপনার সারথিদের আমি বড্ড ভয় করি।

—একা আস্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার ঠিকানাটা ত দেন্‌নি!

যেন মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে, এই ভঙ্গীতে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন, ওঃ, তাই নাকি? দেখুন ত, কিরকম ভুলো মন আমার!...আচ্ছা, ঠিকানাটা লিখে নিন্।

ঠিকানা লিখে নিলাম। পায়ে হেঁটে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে মিনিট দশেকের পথ, গাড়ীতে আরও কম সময় লাগবে। অফিস-ফেরতা যাব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

উনিশ

প্রকাণ্ড একটা ম্যানসন্ এর চারতলায় সুনয়নী দেবীর ফ্ল্যাট। নির্দেশ আগে থেকেই পেয়েছিলাম, খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

চিঠি পড়ে এবং টেলিফোনে কথা বলে সুনয়নী দেবীর একটা মূর্তি আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু মুখোমুখি যখন দেখা হ'ল তখন বুঝলাম, আমার কল্পনা শক্তি কত দুর্বল।

চল্লিশের কাছাকাছি বা তারও একটু বেশী বয়স হয়েছে তাঁর। এককালে হয়ত খুবই সুন্দরী ছিলেন, যার ক্ষীণ আভা এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তাঁর স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখে এবং মধুর একটি হাসিতে। কিন্তু রুজ্ পাউডার ম্যাসকারার প্রলেপে ভগবানদত্ত লাবণ্য বহুদিন

ঢাকা পড়ে গেছে। সব চেয়ে অশোভন লাগছিল বয়সের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বেশভূষা। হাত-কাটা ব্লাউজ এবং অত্যন্ত পাত্‌লা ঘন সবুজ শিফনের শাড়ি—দশ বা পনেরো বছর আগে স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে হয়ত আরও প্রগাঢ় করে তুলত, কিন্তু তা এখন যেন তাঁকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে।

আমি একটু শক্ খেলাম।

সাদর অভ্যর্থনা ক'রে সুনয়নী দেবী আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ড্রইংরুমে। ছোট টেবিলে দু'জনের মত চায়ের পেয়ালা পিরিচ এবং দু'তিন প্লেটভর্তি কেক্ এবং অন্যান্য মিষ্টি সাজানো।

খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরটার চারপাশে। অঙ্গসজ্জা যাই করুন্ না কেন, ড্রইংরুমের আসবাবপত্র, পর্দা, কার্পেট ইত্যাদি সাজানোর পদ্ধতি মার্জিত রুচির পরিচয় দেয়।

আমার কোন আপত্তি সুনয়নী দেবী শুনলেন না। চায়ের পেয়ালা এবং একটা প্লেটে কিছু আহার্য আমাকে তুলে নিতেই হ'ল।

আমি বল্‌লাম, এবার বলুন, কি খবর আপনি দিতে চান।

জবাব এল, বল্‌ছি, আগে চা'টা শেষ করুন।

বুঝলাম, এখানে গৃহকর্ত্রীর হুকুম মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চা-এর পর্ব শেষ হ'ল, সুনয়নী দেবীর বেয়ারা ট্রে নিয়ে এসে পেয়ালা পিরিচ প্লেট তুলে নিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাম্পএর বাতিটা ও জ্বেলে দিয়ে গেল।

সুনয়নী দেবী সুরু কর্‌লেন।

—আপনাকে আমি ডেকেছি দুর্নীতি-দমন বিভাগের সচিব হিসেবে নয়, যদিও এই দপ্তরে এসে আপনি যে dynamism এর সঞ্চার করেছেন তা' আমাদের কারোই অজানা নেই। আপনাকে ডেকেছি ডাঃ দাস হিসেবে।

একটু থাম্‌লেন তিনি। তারপর বলে চল্‌লেন ঃ

—প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই, কাকলিকে আপনি এমনধারা নাস্তানাবুদ করেছিলেন কেন? বেচারী আপনার দপ্তর থেকে সোজা এখানে চলে এসেছিল—ওর চেহারা যদি আপনি দেখতেন আপনার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পুলিশকর্মচারীরও দয়া হ'ত। নার্ভাস ব্রেকডাউন যে হয়নি' এই আশ্চর্য!

আমি বিরক্তিবোধ কর্‌লাম। কাকলি দেবীকে নাস্তানাবুদ করেছি কি না সে সম্বন্ধে জবাবদিহি আমি নিশ্চয়ই সুনয়নী দেবীর কাছে কর্‌বনা।

বিরক্তি গোপন ক'রে শুধু বল্‌লাম, কাকলি দেবী আপনাকে কি বলেছেন জানি না, তবে কোন পুলিশকর্মচারী ওঁকে জেরা করেনি, জেরা যদি কেউ ক'রে থাকে সে হচ্ছে আমি। সেখানে পুলিশের লোক বা অন্য কোন লোক উপস্থিতই ছিল না!

—তাহ'লে বলতে হয়, এই দপ্তরে এসে পুলিসের কায়দাকানুন আপনি নিজেই প্রয়োগ কর্‌ছেন। না, না—এ আমি বিশ্বাস কর্‌তে রাজী নই।

এবার আমি সত্যি রাগ করলাম। বললাম, দেখুন, কাকলি দেবীর বিষয় আলোচনা কর্‌বার জন্য আপনার কাছে আসিনি। আপনি লিখেছিলেন, আরও অনেক কেসএর খবর আপনি জানেন, যাতে কাকলি বা তার সমধর্মী মেয়েরা জড়িত রয়েছে। সে সম্বন্ধে যদি কিছু বল্‌বার থাকে বলুন। আমার সময়ের দাম আছে, বিশ্রম্ভালাপ কর্‌তে আমি আসিনি'।

সুনয়নী দেবী অন্য সুর ধর্‌লেন। বল্‌লেন, আহা, আপনি রাগ করছেন কেন, ডাঃ দাস? কাকলির কথাটা তুললাম এই কারণে যে, ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি, অত্যন্ত স্নেহ করি, তাই ওর অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনারা—যাঁরা সরকারের বড় বড় পদ অধিকার করে রয়েছেন—কি

ব্যবস্থা করছেন যাতে কাকলির মত মেয়ে এইসব পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে?

সমাজ-সংস্কার করা আমার পেশা নয়, একথা সুনয়নী দেবীকে অনায়াসেই বল্‌তে পারতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেও আস্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু তাহ'লে যে উদ্দেশ্যে আসা, সেই অন্যান্য খবর, যে নিতান্তই অজ্ঞাত থেকে যাবে! চুপ ক'রে রইলাম।

সুনয়নী দেবী বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? আপনার নজরে এসেছে এই একটিমাত্র কেস, তা'ও একজন বা ততোধিক কর্মচারী সংশ্লিষ্ট আছেন ব'লে। কিন্তু দেশের যাঁরা বরণীয়, সমাজে যাঁদের প্রতিষ্ঠা আছে, সভাসমিতিতে যাঁরা শ্রদ্ধেয় অতিথির আসন গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও কত লোক আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার ক'রে থাকেন, তার কি বিহিত আপনারা কর্‌ছেন? আপনি হয়ত বল্‌বেন, এসব আপনার দপ্তরের আওতার বাইরে। কিন্তু কোন দপ্তরের আওতার মধ্যেই কি এঁরা আসেন না?

কঠিন প্রশ্ন।

সুনয়নী দেবী বলে চললেন, আপনি আজ নিজের চোখে দেখবেন এঁদের কয়েকজনকে। আপনার টেলিফোন পাবার পর আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

তার মানে? জিজ্ঞাসু চোখে সুনয়নী দেবীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

—আপনাকে ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করতে হবে। এখন মাত্র সাড়ে ছয়টা বেজেছে, ওঁরা আটটা সাড়ে আটটার আগে আস্‌বেন না।

—ওঁরা? ওঁরা কে?

—সে আপনি নিজেই দেখবেন। অর্থপূর্ণ চোখে সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন।

—কোথায়? কি ভাবে?

—এখানেই, আমার ফ্ল্যাট্এ! শুনুন তাহ'লে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমিও এককালে এই পথেরই পথিক ছিলাম। কিভাবে এসেছি সে ইতিবৃত্ত বলবনা, কিন্তু আমার এই বিগত ইতিহাসের জন্যই এখানে অনেক লুব্ধ মধুসন্ধানী বিশিষ্ট ভদ্রলোক আনাগোনা করেন। অর্থের লোভে আমি তাঁদের নানাভাবে সহায়তা ক'রে এসেছি। এখন দেখছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।

বল্‌তে বল্‌তে সুনয়নী দেবীর গলাটা যেন ধরে এল।

দুর্নীতি-দমন বিভাগে থাকার জন্যই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, এই প্রকার melodramatic স্বীকারোক্তিতে আমার মন আর্দ্র হ'ল না। আমি অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম, এর পর আর কি বল্‌বেন।

—আমার মুখের কথা আপনি হয়ত বিশ্বাস কর্‌বেন না, তাই এই চাক্ষুষ পরিচিতির আয়োজন।...আপনি পাশের ঘরে চুপ করে বসে থাক্‌বেন। এখানে কি কথাবার্তা হয় তা' নিজের কাণে শুনে যাবেন। প্রয়োজন হলে keyhole দিয়ে দেখতেও পারেন।

এই নাটকীয় প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সুনয়নী দেবীকে আমি আদৌ চিনি না, কে জানে এর মধ্যে কি ষড়যন্ত্র রয়েছে? Blackmailএর সম্ভাবনার কথাও আমার মনে জাগল।

আমার সন্দিগ্ধদৃষ্টি অনুসরণ করে সুনয়নী দেবী বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন্, আপনাকে বিপদে ফেল্‌বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই! যদি থাক্‌তে না চান্ অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তবে এটুকু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার এখানে আসবার আগে আপনার সহকারীদের আপনি নিশ্চয় বলে এসেছেন আপনি কোথায় এবং কেন যাচ্ছেন। অতএব, আপনাকে বিপদে ফেলে আমি বা আর কেউই রেহাই পাব না!

সত্যি কথা বলতে কি, এই adventureএ আমি পা বাড়িয়েছিলাম নিতান্তই নিজের অহমিকায়। আমার দপ্তরের কেউই জানেনা আমি কোথায় এসেছি। গাড়ীর ড্রাইভারকে পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি। কিন্তু সুনয়নী দেবী ত এ সব কিছুই জানেন না!

মুহূর্তের মধ্যে স্থির করে ফেললাম যে এতদূর যখন এগিয়েছি শেষ পর্যন্ত দেখেই যাব। পকেটের রিভলভারটা অনুভব ক'রে নিলাম।

প্রশ্ন কর্‌লাম, কিন্তু আপনার বেয়ারা? সে কি ভাববে?

—ও আমার বহুদিনের পুরানো চাকর! তা ছাড়া ও এখানকার হাল-চাল জানে, না ডাকা পর্যন্ত এদিকে পা মাড়াবে না!

বললাম, বেশ, আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি।

কুড়ি

পাশের ঘরটা বাক্স-ট্রাঙ্কে বোঝাই, বলতে গেলে গুদাম ঘর। এক পাশে একটা ছোট টেবিল এবং খান দুই চেয়ার রয়েছে। টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প।

সুনয়নী দেবী বললেন, আপনাকে খানকয়েক মাসিকপত্রিকা দিয়ে যাচ্ছি, অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে যদি হাঁপিয়ে ওঠেন তাহলে এগুলোর পাতা ওলটাবেন। বাতির ঢাকনাটা যেন keyholeএর দিকে থাকে, যাতে ওঘর থেকে কেউ সন্দেহ না করে যে এখানে কেউ আছে। আর, যদি চান, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে পারেন!

চাই বই কি! সুনয়নী দেবী বেরিয়ে যেতেই আমি দরজার ছিটকিনিটা এঁটে দিলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম—সাতটা বেজে পনেরো মিনিট।

মনে মনে হাস্‌লাম। এ যে রীতিমত রহস্যোপন্যাস সুরু হচ্ছে! কোথায় এর পরিণতি হবে কে জানে?

একটা চেয়ার দরজার কাছে টেনে নিয়ে এলাম। keyholeএ চোখ দিয়ে পরীক্ষা করলাম, ড্রইংরুমের কতখানি দেখা যায়। দেখলাম, একটা কোণ ছাড়া প্রায় সমস্ত ঘরটাই আমার দৃষ্টির পরিমণ্ডলের মধ্যে আস্‌ছে। আরও দেখলাম, সুনয়নী দেবী চুপ করে সোফার উপর বসে আছেন। একটু পরে একটা সিগারেট ধরালেন। আমার সাম্‌নে উনি সিগারেট খাননি। সঙ্কোচ? কে জানে? আমি ত ছাই সিগারেট খাই না, তাই offer করার কথাও মনে হয়নি!"

সময় যেন কাটতে চায় না। রাত যদিও মাত্র সাড়ে সাতটা, চারদিক অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ, নিঝুম। আমার হাতঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যেন! দূর, তা কি করে সম্ভব হবে? কানের কাছে নিয়ে এলাম হাতঘড়িটা—না কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। সুনয়নী দেবী একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছেন। এমন chainsmoke করতে পারেন, অথচ দু'তিন ঘণ্টা একটা সিগারেটও খান্‌নি! আশ্চর্য!

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। সুনয়নী দেবী নিজেই উঠে দরজা খুলে দিলেন। বিলিতি পোষাকপরা মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক ঢুকলেন!

—হ্যালো, সু, কেমন আছ?…আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

জবাব শুন্‌লাম, যেমন তোমরা রেখেছ। সোজা চেম্বার থেকে এসেছ বুঝি? বাড়ী যাওনি?'

চেম্বার? ডাক্তার না ব্যারিষ্টার? তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম।

ওঃ হরি, ইনি যে কল্‌কাতার বিখ্যাত ডাক্তার সিদ্ধান্ত!

ডাক্তার সিদ্ধান্ত বল্‌লেন, নাঃ, একবার বাড়ীতে ঢুকে পড়লে বেরুনো অসম্ভব। রুগী-টুগী দেখা শেষ ক'রে ফেরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

—আজও রুগী চাই নাকি ?…সুনয়নী দেবী প্রশ্ন করলেন।

—এ আবার কি রকম প্রশ্ন ? তুমি টেলিফোন্ ক'রে আস্‌তে বল্‌লে, আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই নতুন কোন রুগী এসেছে।

—একটা গোলমাল হয়ে গেছে, ডাঃ সিদ্ধান্ত ! যে রুগী আস্‌বার কথা ছিল একটু আগে টেলিফোন পেলাম তার—অন্যত্র বুকিং হয়ে গেছে, আজ সে আসতে পার্‌বে না !

—Oh, damn ! কে এই মেয়েটা ? শেষ মুহূর্তে কোথায় তার বুকিং হ'ল ?

—গীতা। সীতার বোন্ গীতা।…সীতাকে মনে আছে ত ? সীতাই টেলিফোন করে জানল শ্রীযুত—ভট্টাচার্যের ওখান থেকে তার বোনের ডাক এসেছে, priority call, উপেক্ষা কর্‌বার যো নেই।

—দেখছি সাম্‌নের ইলেক্‌শনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। এসব আজে-বাজে priority ধূলিসাৎ ক'রে দেব।…বেশ জোরের সঙ্গেই ডাক্তার সিদ্ধান্ত বল্‌লেন এবং উঠে পড়লেন।

—ওকি, চলে যাচ্ছ যে ? অন্ততঃ একটা drink খেয়ে যাও।… সুনয়নী দেবী অনুরোধ কর্‌লেন।

—না। আজকের রাতটা তুমি একেবারে মাটি করে দিয়েছ। একটু আগে যদি আমাকে জানাতে তাহ'লে একটা বড় কেস্ হাতছাড়া কর্‌তাম না।

ডাক্তার সিদ্ধান্ত বেরিয়ে গেলেন। ঘড়ির দিকে তাকালাম, আটটা বেজে কুড়ি মিনিট।…আর ভাবতে লাগলাম, অবশেষে শ্রীযুত—ভট্টাচার্য ও এই দলে ? সুনয়নী দেবী ভুল বলেন নি, দেশের যাঁরা বরণীয়, সভা সমিতিতে যাঁরা শ্রদ্ধেয় আসন গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাঁরাও বাদ্ যান্ না !

সুনয়নী দেবী আমার দরজার কাছে এসে মৃত্নস্বরে বললেন, সব শুন্‌তে পেলেন ত ? যিনি এসেছিলেন এবং যাঁর কথা বলা হল তাঁদের হু'জনকেই চিন্‌তে পেরেছেন আশা করি।

আমি জবাব দিলাম, সব শুনেছি এবং দেখেছি। এখন বেরিয়ে আসব?

—না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। আরেকজন আস্‌বার কথা আছে।

একুশ

মিনিট দশ পনেরো কাটল। তারপর আবার কলিং বেল বেজে উঠ্‌ল। সুনয়নী দেবী এগিয়ে গেলেন।

এবার ঢুক্‌লেন এক যুগল। পুরুষটির বয়স পঞ্চাশেরও বেশী হবে, ধুতি চাদর পরা। সঙ্গের মেয়েটির বয়স সতেরো আঠারো।

—মাধুরীকে একেবারে সাথে নিয়ে এসেছেন, সীতেশবাবু?... আমি ত আপনাকে একা আসতে বলেছিলাম।

মেয়েটি একটু অপ্রস্তুতভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। সীতেশবাবু বললেন, কেন, আর কারো আস্‌বার কথা আছে না কি?

—আছে বৈ কি! একটু বিরক্তির সঙ্গেই সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন।

—তা হোক, তোমার ত দুটো ঘর রয়েছে। একটাতে আমরা চলে যাই, বেশীক্ষণ থাকব না। আরেকজনের ব্যবস্থা তুমি যা হয় ক'রো।

বলে সীতেশবাবু পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুনয়নী দেবী বাধা দিয়ে বললেন, না সীতেশ বাবু, সে হয় না। শুধু শুধু একটা অনর্থের সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা আজ চলে যান।

—কিন্তু মাধুরী?

—মাধুরী আমার দায়িত্ব নয়, সীতেশবাবু। আমাকে যদি ঘুণাক্ষরেও জানাতেন, আমি আপনাকে বারণ করতাম।

—তোমার পাওনা আমি আজ ডবল দিতে রাজী আছি।

—মাপ কর্‌বেন, তবু পারব না।···দৃঢ়স্বরে সুনয়নী দেবী বললেন।

—তোমার এই একগুঁয়েমি আমার মনে থাকবে, সুনয়নী। ভুলে যেয়ো না, আমি ব্যারিষ্টার, সরকারী মহলে আমার অবাধ গতি, তোমাকে বিপদে ফেল্‌তে পারি।

—চেষ্টা ক'রেই দেখুন না, সীতেশবাবু! বিপদের সম্ভাবনা এক তরফা নয়, তা আপনি ভুলে যাবেন না।

ওদের কথাকাটাকাটির মধ্যে মাধুরী ব'লে মেয়েটি এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল। সে এবার মুখ খুলল। সীতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, বাইরে যাই। আমাকে দশটার মধ্যে বাড়িতে ফিরতেই হবে, নইলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সীতেশবাবু মাধুরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে সুনয়নী দেবী আমাকে উদ্দেশ বন্ধ ক'রে বললেন, এবার বেরিয়ে আস্‌তে পারেন, ডাঃ দাস। আর কেউ আস্‌বে না।

আমি বেরিয়ে এলাম। বললাম, কিন্তু আপনি যে বললেন আর একটি মেয়ে আসবার কথা আছে।

—ওটা ভাঁওতা দিয়ে বলেছি। আপনাকে আর কতক্ষণ আট্‌কে রাখব, তাই তাড়াতাড়ি ওদের বিদেয় ক'রে দিলাম।···আশা করি আপনি এবার বুঝ্‌তে পেরেছেন—কলকাতার বুকে আজকাল কি চলেছে এবং কারা এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট।

আমি সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন কর্‌লাম, সীতেশবাবুকে ধুতি-চাদরে প্রথমে চিনতেই পারিনি। উনিই না সেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, যিনি স্বদেশী যুগে একটি পয়সা না নিয়ে বিপ্লবী জয়রতন সিংএর defence counsel এর ভূমিকায় নেমেছিলেন!

সুনয়নী দেবী ঘাড় নেড়ে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ডাঃ দাস।

—ওঁর এই মতিগতি? এখনও আমার বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না!

—অসম্ভাব্যকেও বিশ্বাস কর্‌তে শিখুন, ডাঃ দাস। আজ যেটুকু দেখলেন সে ত সামান্য একটা পরিচ্ছেদ মাত্র। আরও কত এমন পরিচ্ছেদের পরিচয় আপনাকে দিতে পারি, যদি আপনার ধৈর্য থাকে!

—কিন্তু আপনিও ত এর অন্যতম অংশীদার। আমার সাম্‌নে এসব তুলে ধর্‌বার কারণ?

—খেয়াল, ডাঃ দাস, নিছক খেয়াল।...অথবা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস। না, তা'ও নয়। আমি শুধু জানতে চাই, কি ক'রে এই বেড়াজালের মাঝ থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি। এরা ত আমাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না, কিন্তু মুক্তি আমি চাই। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই বদ্ধ হাওয়া।

বল্‌তে বল্‌তে সুনয়নী দেবী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

সুনয়নী দেবী বলেছিলেন এই জাতীয় আরও অনেক পরিচ্ছেদের পরিচয় আমাকে দেবেন, কিন্তু নিয়তির বিধানে সেটা ঘটল না। এই adventureএর কয়েকদিন পরেই খবরের কাগজে দেখলাম গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডএ এক মোটরত্বর্ঘটনায় সুনয়নী দেবী মারা গেছেন। ততদিনে ত্বর্নীতিদমন দপ্তরে আমার মেয়াদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, সুনয়নী দেবীর উত্তরাধিকারী বা বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু সুনয়নী দেবী আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন। ক্ষণিক খেয়ালের বশেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বাংলাদেশের যে ছবির সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তার সম্যক্ রূপ আমি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারতাম না, যদি সাহস ক'রে সেদিন ঘণ্টা তিনচার তাঁর ফ্ল্যাটএ না কাটাতাম।

বাইশ

কাকলি দেবী সুনয়নী দেবীদের কাহিনী থেকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির একটা দিকের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন, যা' হয়ত আপনাদের মনে হয়েছে stranger than fiction অর্থাৎ উপন্যাসের চেয়েও বেশী চমকপ্রদ। কিন্তু এটা একটা আংশিক পরিচয় মাত্র। আরও অনেক দিক আছে যা দেখবার এবং জানবার সৌভাগ্য (দুর্ভাগ্যও বলতে পারেন) আমার হয়েছিল, প্রধানতঃ দুর্নীতিদমন বিভাগের দৌলতে।

পাঁচশালা পরিকল্পনায় জনকল্যাণ-প্রসারী নানা কর্মসূচির অজুহাতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। টাকাটা প্রথমে দিই আমরা, দেশের সাধারণ করদাতার দল। তারপর তা' জমা হয় সরকারী তহবিলে এবং প্রতিবছরই সেই তহবিল থেকে একটা মোটা অঙ্ক সরকার তুলে দেন নানা বেসরকারী অথবা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে। গত পাঁচবছরের মধ্যে, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হওয়া অবধি, ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে।

সরকারী তহবিল থেকে তুলে দেওয়া এই টাকার কিভাবে অপচয় হয় দুর্নীতিদমনবিভাগে বদলী হবার অনেক আগে থেকেই তার খানিক আভাস পেয়েছিলাম। সম্যক পরিচয় পেলাম যখন কয়েকজন অপরিচিত সংবাদ দাতার অনুগ্রহে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে হ'ল।

প্রথমে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি যে, যে সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রয়েছেন দেশপূজ্য নমস্য নরনারী তার মধ্যেও এমন ধারা গলদ থাক্‌তে পারে। পরে দেখলাম, অধিকাংশক্ষেত্রেই কর্ণধারেরা শিখণ্ডী মাত্র—তাঁদের পুরোভাগে রেখে টাকার নানা অপব্যয় করছেন

মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থলোলুপ, স্বার্থান্ধ ব্যক্তি। কর্ণধার সংশ্লিষ্ট সভাসমিতিতে উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েই খুসী, আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখবার না আছে আগ্রহ, না আছে চেষ্টা।

কর্ণধারদের এইপ্রকার আলস্য আমাদের দেশের একচেটে নয়, অল্পবিস্তর সব দেশেই এই এক রীতি, এক ধারা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বাঁচোয়া হচ্ছে—সক্রিয় এবং সজাগ জনমত, আর বাঁচোয়া হচ্ছে—সরকারের নানা কঠিন বিধিব্যবস্থা। আমাদের দেশে এই উভয় শোধকেরই (corrective) অভাব দেখতে পেয়েছিলাম।

মনে পড়ে, আমার কাছে একদিন খবর এসেছিল দেশেরই বিখ্যাত এক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। সংবাদদাতা তাঁর নাম দেন্‌নি। তাঁর ভয়, নামপ্রকাশ হ'লে তিনি হয়ত বিপদে পড়বেন। তবে তালিকা দেখে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না যে তিনি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের লোক, এমন পঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বাইরের কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভবপর হ'তনা।

প্রাথমিক তদন্ত ক'রে জান্‌লাম, একজন মন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সভাপতি। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পেশ করলাম।

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। আমাকে ডেকে বললেন, ডাঃ দাস, এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, নিতান্ত ঈর্ষাপ্রসূত। আমি জানি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটো দল রয়েছে, বিরোধীপক্ষ তাদের খুসীমত প্রতিষ্ঠান চালাতে পারছেনা ব'লেই এই সব আজগুবি কথা আপনার কাছে লিখেছে।

সম্ভাবনাটা আমি অস্বীকার করলাম না, কিন্তু বিনীতভাবে জানালাম যে সংবাদদাতার চিঠিকে আমিও gospel truth বলে মেনে নিইনি', আমি নিজে খানিকটা তদন্ত করেছি এবং অধিকাংশ অভিযোগই ভিত্তিমূলক ব'লে আমার মনে হয়েছে। তবু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমি আসিনি', আমি বিষয়টা তাঁর সাম্‌নে উপস্থাপিত

করেছি যাতে পরে তিনি বিব্রতবোধ না করেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে চাই।

তিনি বললেন যে কাগজপত্র ভাল করে দেখে আমাকে পরে জানাবেন।

তখনই বুঝলাম, তিনি চাননা যে বিষয়টার কোন ব্যাপক তদন্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নোংরা কাপড় জনসাধারণের সামনে ধোওয়া হ'লে তাঁর গায়েও ছিঁটেফোঁটা লাগবে, এই তাঁর ভয়।

হয়ত তাঁর এই attitude সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিলনা, কিন্তু আমার মতে তিনি একটা প্রকাণ্ড ভুল করলেন। যারা সরকারের টাকা অপব্যয় করে, শুধু অপব্যয় নয়, আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে, তাদের ক্রিয়াকলাপের উপর আলোক সম্পাত করলে জনসাধারণের সাম্‌নে সরকারের তথা মন্ত্রীপর্ষদের মুখ খাটো হয়না, সরকারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস বরং দৃঢ়ীভূত হয়।

সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল এইজন্যে যে, বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়াতে মন্ত্রী মহোদয়ের কোনই ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁর বন্ধুপ্রীতি। তাই দু'একজন লোককে ডাঃ দাসের দপ্তরের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার এই প্রয়াস।

জনস্বার্থের দিক থেকে এটা মোটেই কল্যাণকর হয়নি'। আইনসভায়ও মন্ত্রীমহোদয় রেহাই পান্‌নি', বিরোধী দল নানা প্রশ্ন ক'রে তাঁকে উদ্ব্যাস্ত ক'রে তুলেছিল। অবশ্য ভোটাধিক্যের ফলে তিনি আইনসভার যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু অনেকের মনেই একটা সংশয় থেকে গিয়েছিল যে, বাইরে যা দেখা যাচ্ছে ভেতরের ফাটল তার চেয়ে অনেক গভীর। ব্যাপক তদন্ত করবার সুযোগ পেলে আমি হয়ত প্রমাণ করতে পারতাম যে, অধিংকাংশ অভিযোগই ভিত্তিহীন বা অতিরঞ্জিত।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে আমি কোনসময়ই inquisitorএর ধড়াচূড়ো পড়ে তদন্তে নামিনি', যদিও বাইরে থেকে অনেকে মনে

করতেন যে ডাঃ দাসের আওতায় আসার মানে হচ্ছে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া। এর আগে অন্য প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে অনেক কর্মচারীকে, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, clearance certificate দিয়েছি। আমার সেই সার্টিফিকেট এখনও অনেকে সগৌরবে তাঁদের সতীর্থ বা উপরওয়ালাদের দেখান্।···বেসরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতিবাদে কোন সীরিয়াস দুর্নীতি আমি দেখতে পাইনি'। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটির কাছ থেকে সেদিনও আমি নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। ছাপান চিঠির নীচে সেক্রেটারী নিজহাতে লিখেছেন, আপনার তদন্তের ফলে আমরা, যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছি, বুকে যে কতখানি বল পেয়েছি তা' আপনি বুঝতে পারবেন যদি সময় ক'রে আমাদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আস্‌তে পারেন।

দুঃখের বিষয় সুদূর বম্বে থেকে তাঁদের এই উৎসবে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। শুধু চিঠিতেই আমার শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম।

তেইশ

বেসরকারী প্রতিষ্টানগুলোর কথা বলতে গিয়ে একটা কেস্ মনে পড়্‌ছে।

আরেকজন অপরিচিত সংবাদদাতার চিঠি। একটি স্বল্পবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কীর্তিকাহিনী। অভিযোগ করা হয়েছে যে অপচয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা এবং হয়ত বা একজন মন্ত্রীও।

যেহেতু একজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, উপরওয়ালার হুকুম ছাড়া তদন্ত স্বরু করা আমার ক্ষমতাবহির্ভূত। কিন্তু আমার পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে মৌখিক হুকুম চাইলে হয়ত পাবনা, অথবা হয়ত বলা হবে যে আর কেউ তদন্ত করবেন, আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

তাই আমি জেনেশুনে একটু দুষ্টুমি করলাম। অপরিচিত সংবাদ-দাতার চিঠির কপিসহ উপরওয়ালাকে লিখলাম, কোন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ যদি না থাকত তাহলে আমি বিনা হুকুমেই তদন্ত স্বরু করতাম। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করি।

বলা বাহুল্য, আমার এই লিখিত অনুমতি চাওয়াটা উপরওয়ালা পছন্দ করেননি'। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, এ আবার কি আপদ্!

দুহপ্তা কেটে গেল, চিঠির কোন জবাব নেই। তাগিদ দিয়ে আবার চিঠি লিখলাম।

উপরওয়ালা তবু নীরব। আমিও নাছোড়বান্দা। দ্বিতীয় তাগিদ পাঠালাম।

অবশেষে, প্রথম চিঠি লেখবার দেড়মাস পরে, জবাব এল, সরকারের কোন আপত্তি নেই।

জবাব পাবার পর রাইটার্স বিল্ডিংএ গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলুন ত, অনুমতি দিতে এত দেরী হ'ল কেন?

—আপনি বড্ড বেয়াড়া, ডাঃ দাস। দেখুন ত, সরকারকে আপনি কি false positionএ ফেলেছিলেন! আপনার লিখিত প্রার্থনার উত্তরে ওঁরা কি বলতে পারেন যে আপনাকে তদন্ত করতে হবেনা, আর কেউ করবে? তাহ'লে ত আপনারই triumph হ'ত!

যেন কিছু বুঝতে পারছিনা এই ভাণ করে প্রশ্ন করলাম, আমার triumph হত? কেন? কি ভাবে?

—আর কেন বোকা সাজছেন, ডাঃ দাস? triumph হ'ত এই

যে আপনি বলতেন, যেহেতু একজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ রয়েছে, সরকার ভয় পাচ্ছেন আপনার হাতে তদন্তের ভার তুলে দিতে। অথচ রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ আপনার যা খ্যাতি, তাতে আপনার আওতায় নিজেকে সমর্পণ করে দিতে অনেকেই ভয় পান্।

—আমার চিঠি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বুঝি?

—আলোচনা কি হয়েছে বা না হয়েছে, জানি না। তবে এটুকু জানি যে আপনার চিঠির কথা শুনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অত্যন্ত upset হয়ে গিয়েছিলেন। একজন সামান্ত সচিব একজন মন্ত্রীর কার্যকলাপের তদন্ত করবে এত বড় আস্পর্ধা! যাই হোক্, অবশেষে অনুমতি দিতেই হ'ল, কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে নয়। এ যেন জোর করে অনুমতি আদায় করা!

—কিন্তু আমার সংবাদদাতা মন্ত্রীমহোদয়ের বিরুদ্ধে খুব বেশী কিছু ত বলেননি'। খানিকটা সম্ভাবনার কথা বলেছেন মাত্র!

—ভয় পাবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট।...আসুন, এক কাপ চা খান্। I congratulate you on having won your point in this astute fashion!

যথারীতি তদন্ত ক'রে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলাম। কংগ্রেসের কর্মকর্তাটি এবং ছ'জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগই মোটামুটি প্রমাণিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতি বা অপচয়ের সঙ্গে বেচারী মন্ত্রীমহোদয়ের কোনই সংশ্রব ছিল না। আমার রিপোর্টে আমি বলেছিলাম যে দলাদলি এবং ঈর্ষাপ্রসূত হয়ে সংবাদদাতা মন্ত্রীমহোদয়ের নামে ঐ প্রকার মানহানিকর উক্তি করেছিলেন।

এরও মাসখানেক পরে অন্য কি একটা কাজ উপলক্ষে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে তিনি খুসীই হয়েছিলেন যে আমাকে তদন্তের ভার দেওয়া হ'ল। কারণ তিনি জান্তেন যে তিনি সম্পূর্ণ

নিরপরাধ এবং আমার কাছ থেকে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট যে পাবেন, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনই সংশয় ছিলনা।

মন্ত্রী মহোদয়কে আমার বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে রাখব এ রকম স্পর্ধা আমার নেই, তবে এটুকু বলতে পারি যে এই ঘটনার পর আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি অনেকখানি ঘনীভূত হয়েছিল, যার নিদর্শন আজও আমি পাই।

চব্বিশ

বাইরে থেকে অনেকের ধারণা যে আমার তদন্তগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী কর্মচারী এবং কংগ্রেসী দলভুক্ত লোক। এ ধারণা অমূলক।

সরকারী কর্মচারীর গোষ্ঠী অবশ্য দুর্নীতিদমন দপ্তরের সবচেয়ে বড় target, কিন্তু বেসরকারী নর-নারীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেসদলভুক্ত, এটা সত্যি নয়। পারমিট্ এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত দুর্নীতির ব্যাপারে, বাস্তুহারাদের ঠকিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার কৌশলে, কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে বাজে মাল পাচার করবার কাজে, কংগ্রেস বহির্ভূত লোকেরাও কম যান্ না, এই হয়েছিল আমার অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ, যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের কোন পলিটিক্যাল লেবেল দেওয়া অনুচিত। তাদের কোন জাত নেই, তারা সবাই এক পথের পথিক। তবে, দুর্নীতি নিরাকরণ বিষয়ে কংগ্রেসের মস্তবড় একটা দায়িত্ব আছে বই কি, কারণ কংগ্রেস পার্টিই হচ্ছে সরকারী মস্‌নদের অধিকর্তা।...এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ব্যাখ্যা করব।

আপাততঃ আর একটা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনীর কথা বলছি।

বাংলা দেশের সবাই জানে যে কংগ্রেসীদল সরকারী মস্‌নদের অধিকর্তা হ'লেও প্রায় প্রত্যেক দপ্তরেই সরকারী কর্মচারীদের

মধ্যে অল্প বিস্তর left-wing sympathisers রয়েছেন। আমাদের দুর্নীতিদমন দপ্তরেও ছিল।

দপ্তরের ভার নিয়েই আমি আমার অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে কারো কোন পলিটিক্যাল লেবেল নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবনা। যাঁর বিরুদ্ধেই আমরা অভিযোগ পাব, নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে তদন্ত করব, তিনি যে কোন দলের মহারথীই হোন্ না কেন।

তবু দু'একজন অফিসারের বোধ হয় ধারণা ছিল যে ডাঃ দাস মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁর নিশ্চয়ই সহানুভূতি রয়েছে তাদের প্রতি—যারা কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে।

তাই যখন একজন বিশিষ্ট বামপন্থী ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কতকগুলো অভিযোগ আমাদের কাছে এল, আমার একজন অফিসার আমার মতামত জান্‌তে চাইলেন যে কি ভাবে তদন্তটা করবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জবাব দিলাম, কি ভাবে? অন্যান্য তদন্ত যে ভাবে করা হয় ঠিক সেই ভাবে। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

আম্‌তা আম্‌তা করে তিনি বললেন, না, স্যার, জিজ্ঞেস করছি এই জন্য যে উনি নিজেই সরকারের নানা দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে খবর দিয়ে থাকেন, বলতে গেলে আমাদের বিভাগের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক।

হেসে বললাম, তার মানে একজন বড় hypocrite! অভিযোগগুলো কতদূর সত্যি জানিনা, তবে যা' লিখেছে তার এক চতুর্থাংশও যদি প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে বলব যে যত শীগগীর উনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকের আসন থেকে নেমে আসেন, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল।

—এর ফলে বিরুদ্ধবাদী কাগজগুলোও আমাদের পেছনে লাগবে, স্যার।

—লাগুক। আমাদের নির্ব্যক্তিক attitude থেকে আমরা এতটুকু নড়বনা, তার ফলাফল যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।

বলা বাহুল্য, এর কিছুদিন পরেই ডাঃ দাসের দপ্তরের high-handedness সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী দু'তিনটা কাগজে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' প্রেরিত খবর বেরিয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা ডাঃ দাসকে আক্রমণ করেন নি', এ জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে দুর্নীতির হাওয়া দেশে এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন বিশিষ্ট শ্রেণী বা দলের মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ নেই। যাঁরা ক্ষমতার আসনে আসীন তাঁরা যে প্রলুব্ধ হবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যাঁদের সে সুযোগ হয়না তাঁরাও চেষ্টা করতে থাকেন কি ভাবে ফাঁকতালে দু'পয়সা কামানো যায়। চেষ্টায় অকৃতকার্য হ'লে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই আবার জোর গলায় প্রচার করতে থাকেন প্রথম শ্রেণীর অসাধুতার তালিকা!

উদাহরণস্বরূপ একটা কাহিনী বলছি। হঠাৎ একদিন টেলিফোন বেজে উঠল। কংগ্রেসের বিপক্ষ দলের একজন মাঝারিগোছের নেতা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

বললাম, আসুন।

—আপনার বাড়ীতে আস্তে পারি কি?…অপরপ্রান্ত থেকে অনুরোধ এল।

বললাম, বাড়ীটাকে দপ্তর বানিয়ে ফেলতে চাই না, শ্রীযুত রাহা। আপনি নিশ্চয়ই দুর্নীতির খবর দিতে চান্, সেটা আমার দপ্তরে বসেই শুন্‌ব। ভয় নেই, আর কেউ উপস্থিত থাক্‌বে না, যা' বলতে চান গোপনে একমাত্র আমাকেই বলবেন।

শ্রীযুত রাহা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, আমি চাই না যে আমার নাম বাইরে প্রকাশিত হয়। তাই আপনার বাড়ীতে আস্তে চেয়েছিলাম।

জবাব দিলাম, আমার দপ্তরে এলেও কেউ জানবেনা কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছিলেন। আমার এখানে কত লোক কত কাজ উপলক্ষে যায় আসে, আপনাকে মাত্র একদিন আমার দপ্তরে হাজিরা দিতে দেখলে লোকে কি করে বুঝবে আপনি কেন এসেছিলেন। তা ছাড়া, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যে খবরই আপনি আমাকে দিন না কেন, আপনার নাম-ধাম প্রকাশ করব না।

শ্রীযুত রাহা অবশেষে আমার দপ্তরেই এলেন। প্রথমেই সুরু করলেন আমার সৎসাহস এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা। প্রশংসা শুনলে স্বয়ং মহাদেবও গলে যান, আমি ত সাধারণ মানুষ মাত্র। তবু দুর্নীতিদমন দপ্তরের আবহাওয়ার গুণেই হোক্, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, আমি আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পেতে দিলাম না।

বললাম, প্রশংসা থাক। এখন কাজের কথা বলুন।

শ্রীযুত রাহা তখন আরম্ভ করলেন এক বিরাট মহাভারত—নানা লোকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমি অনুসন্ধান করব।

—একটু তাড়াতাড়ি করে তদন্ত করবেন ডাঃ দাস। নইলে ওরা সাক্ষ্য প্রমাণ সব নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবে!

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তদন্ত করেছিলাম। কিন্তু তদন্তের ফলে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল তাতে কংগ্রেসী দলের চেয়ে তাঁর দলের লোকই জড়িয়ে পড়লেন বেশী। শ্রীযুত রাহাও বাদ গেলেন না।

রিপোর্ট তৈরী করছি, হঠাৎ শ্রীযুত রাহার টেলিফোন্। বললেন, ডাঃ দাস, এসব কি শুন্‌ছি?

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না এই ভাণ করে বললাম, কি বিষয়ে উল্লেখ করছেন?

বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে তিনি বললেন, যে বিষয় নিয়ে আপনার দপ্তরে এসেছিলাম। আমি যে সব খবর দিলাম আপনি তার

ধারপাশ দিয়েও গেলেন না, এখন শুন্‌ছি উলটে আমার ঘাড়েই দোষ চাপানো হচ্ছে।

জবাব দিলাম, একটা সূতো ধরে আমাদের এগোতে হয়, শ্রীযুত রাহা। আপনি সূতোটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, তা' অনুসরণ করতে গিয়ে নতুন তথ্য যদি বেরিয়ে পড়ে তাহলে তা' চাপা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে আপনাকে আবার বলছি, তদন্তটা ব্যাপক ভাবেই করা হয়েছে। ফলে যদি অপরের আলমারীতে লুকানো কঙ্কাল আবিষ্কার হয় তাহ'লে অপরাধ কি আমাদের, শ্রীযুত রাহা ?

—কাজটা ভাল করলেন না, ডাঃ দাস।

জবাব দিলাম, এ দপ্তরের কোন কাজই ভাল নয়, শ্রীযুত রাহা। তবে যতদিন আমাকে এই আসনে বসিয়ে রাখা হবে, আমাকে কাজ ক'রে যেতে হবে, আমার সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে! কার ভাল করলাম, কার মন্দ করলাম, সেটা অনুধাবন করবার অবসর আমাদের সব সময় হয় না।

পঁচিশ

দুর্নীতি কমাতে হ'লে সবচেয়ে আগে দরকার জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন এবং সক্রিয় করা। অবশ্য, বাংলাদেশের জনমত সরকারী মহলে এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্নীতির উপস্থিতি সম্বন্ধে খুবই সচেতন, হয়ত বা একটু অস্বাভাবিকভাবে সচেতন। কিন্তু চেতনাই একমাত্র প্রতিরোধক নয়, চেতনার সঙ্গে থাকা চাই নৈতিক সাহস এবং সক্রিয়তা। সাহসের পরিচয় অনেক পেয়েছি, কিন্তু সক্রিয়তার অভাব আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি।

সাহস এবং সক্রিয়তা এই শব্দ দুটোর একটু বিশদ্ ব্যাখ্যা করা

দরকার। সাহসের কথা আসে দুর্নীতি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করায়, কর্তৃপক্ষ অবহিত না হ'লে আইন সভার সদস্যদের কাছে বা সংবাদপত্রে তা' পেশ করায়। আর সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দুর্নীতির অস্পষ্ট অতিরঞ্জিত কাহিনী বিশ্লেষণ করে তার মাঝ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং প্রমাণযোগ্য অভিযোগগুলো উপস্থাপিত করা হয়।

বাংলাদেশের বিধান সভায় প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই বিরোধীপক্ষ দুর্নীতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকেন। কয়েকটি অধিবেশনে আমি দর্শক হিসেবে উপস্থিতও ছিলাম। আমি দেখেছি, যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে তার অধিকাংশই এত ব্যাপক এবং অপরিস্ফুট যে তা' অমূলক বা অতিরঞ্জিত প্রমাণ কর্‌তে সরকারী পক্ষকে এতটুকু পরিশ্রম করতে হয়নি'। ফল হয়েছে এই যে, এই সব অভিযোগের মধ্যে খানিকটা সত্যতা থাক্‌লেও ব্যাপকতা ও অত্যুক্তির প্রবাহে তা' ঢাকা পড়ে গেছে।

অবশ্য বিরোধীপক্ষের অসুবিধা অনেক। তাঁরা অভিযোগ উপস্থাপিত করেন নানা উড়ো খবরের উপর নির্ভর করে। সে সব খবর যে কতদূর সত্যি তা' যাচাই করে দেখবার মত সুযোগ এবং সুবিধা তাঁদের নেই। তবু আমার মনে হয়েছে, একটু শ্রম স্বীকার করলে তাঁরাও এমন সব তথ্য উপস্থাপিত করতে পারতেন—যার জবাবদিহি করতে সরকারী পক্ষকে রীতিমত হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ত। আমি সবচেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম যে একজন তীক্ষ্ণধী প্রাক্তন-মন্ত্রী প্রায় একবৎসরকালীন সরকারী দপ্তরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অভিযোগগুলো সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করতে পারলেন না। দুর্নীতি বিভাগের সচিব হিসেবে আমি যে সব গলদের কথা জান্‌তাম তা তাঁরও অজানা থাক্‌বার কথা নয়, অথচ তাঁর চার্জসীটে অতি অকিঞ্চিৎকর দু'একটা ঘটনা ছাড়া বড় রকমের দুর্নীতির specific উল্লেখ খুবই সামান্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক মুন্দ্রা প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার কেনার ইতিহাস কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। শ্রীযুত ফিরোজ গান্ধী যে নৈপুণ্যের সঙ্গে লোকসভায় এই ব্যাপারের প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। অকাট্য কতকগুলো তথ্য তিনি পেশ করতে পেরেছিলেন বলেই না প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত নেহেরু বিচারপতি চাগলাকে তদন্তের ভার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপব ধীরে ধীরে যে বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা জনসাধারণ এখনও ভোলেনি। এই আলোক-সম্পাতের impact যে বহুদূরপ্রসারী হয়েছে তা' নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

আমার মনে হয় বাংলা দেশের বিরোধী পক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনেক সময়ই উপস্থাপিত করেন পলিটিক্যাল খেলার একটা অংশ হিসেবে। কিন্তু তাতে স্থায়ী কোন ফল হয় না, দুর্নীতি এতটুকু কমে না, খবরের কাগজে এবং চায়ের আড্ডায় খানিকটা হৈ চৈ হয় মাত্র।

এর জবাবে হয়ত বলা হবে, আইন সভাগুলোয় সরকার পক্ষের যে brute majority রয়েছে তাতে কিছুতেই তাঁদের টনক নড়বে না। বিরোধী পক্ষ যদি অকাট্য প্রমাণও উপস্থাপিত করেন তবু সরকারপক্ষ নির্বিকার থাক্‌বেন। কারণ তাঁরা জানেন যে party whipএর সাহায্যে স্বপক্ষে comfortable majority জোগাড় করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

এই যুক্তির মধ্যে খানিকটা লজিক হয় ত আছে, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে এর সত্যতা আমি মেনে নিতে রাজী নই। সরকার পক্ষ তদন্ত করতে রাজী হ'ন্ বা নাই হ'ন্, যে কোন দায়িত্ববোধসম্পন্ন বিরোধী পক্ষের সদস্যের উচিত—প্রকাশ্যে অভিযোগ করবার আগে তা যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে নেওয়া। এতে একদিক দিয়ে তাঁদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়বে, অপর দিক দিয়ে

সরকারীপক্ষও আজ না হয়, দুদিন বাদে, জনমতের সাম্‌নে মাথা নীচু করতে বাধ্য হবেন।

ছাব্বিশ

দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন এবং সক্রিয় করে তোল্‌বার ব্যাপারে খবরের কাগজগুলোর একটা মস্ত দায়িত্ব রয়েছে। দুর্নীতিদমন বিভাগে আমার এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বল্‌তে পারি যে, বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো এই দায়িত্ব মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছে এবং এখনও করছে।

যাঁরা দুর্নীতির পোষক বা যাঁরা জেনে-শুনেও স্বীকার করতে চান্‌ না যে সরকারের কাঠামোয় দুর্নীতি রয়েছে, তাঁরা অবশ্য বলবেন যে বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো অধিকাংশ সময়ই sensationalismএর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, সংবাদের সত্যতা যাচাই করবার স্পৃহা বা চেষ্টা তাদের নেই, বিশেষ করে সংবাদটা যদি সরকারকে হেয় বা অপদস্থ করতে সাহায্য করে।

বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো সম্বন্ধে এই অপবাদ আমি মেনে নিতে রাজী নই। বিদেশী খবরের কাগজ দেখবার এবং পড়বার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হয়, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে অনেক বিদেশী খবরের কাগজের তুলনায় আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো বেশী দায়িত্ববোধসম্পন্ন। ইংরেজীতে যাকে বলে yellow journalism তার নিদর্শন আমাদের দেশে খুবই কম, বিশেষ করে দৈনিক কাগজগুলোয়।

আমি বরং বলব যে আমাদের দেশের কাগজগুলো আজও ডেমক্রেসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান যে কত উঁচু স্তরের তা অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ আছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগেও তারা তাদের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। নির্ভয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে সরকারের রীতিনীতি

কার্যকলাপের সমালোচনা করে তারা জনমতকে করে রেখেছে সক্রিয়, সুস্থ এবং সবল। আজকের যুগে, যেখানে সরকারী প্রোপাগাণ্ডা বট গাছের শিকড়ের মত দেশের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি সংস্থায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে, বেসরকারী, স্বাধীন এবং নির্ভীক সংবাদপত্রের প্রয়োজন যে কত বেশী তা' বলা যায় না।

দুর্নীতির ব্যাপারে বাংলাদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজ খুবই সাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং এখনও দিচ্ছে। জনসাধারণের উপর এই কাগজগুলোর প্রভাবের খবর সরকার জানেন, তাই আমি অনেক সময়ই লক্ষ্য করে'ছি যে এদের পৃষ্ঠায় সরকারী মহলের দুর্নীতির কোন খবর প্রকাশ হলেই সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। চাঞ্চল্য আরও গভীর হ'ত, যদি খবর অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নির্ভুল থাকত।

আমার মনে পড়ে, একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, আমার অফিসারেরা যদিও যথাসম্ভব গোপনে তদন্ত করেছেন—তবু রিপোর্টারেরা মোটামুটি ব্যাপারটি জেনে নিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই একটি দৈনিক কাগজে বড় বড় হেড লাইন্‌এ নিজস্ব সংবাদদাতার খবর প্রকাশিত হ'ল।

রাইটার্স বিল্ডিংসএ সে কি হৈ চৈ! আমাকে প্রশ্ন করা হ'ল, খবরটা leak করল কেন এবং কি ভাবে। আমি জবাব দিলাম, উপযাচক হয়ে আমাদের দপ্তরের কেউ সংবাদদাতাকে খবরটা দেন্‌নি'। তবে রিপোর্টারেরা অন্ধ নন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে ডাঃ দাসের অফিসারেরা কয়েক দিন ধরে ক্রমাগত সেই প্রতিষ্ঠানে আনাগোনা করছেন। আমাদের অফিসারেরা মৌনী থাক্‌তে পারেন, কিন্তু যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের মুখে কাপড় চাপা দেওয়া সহজ নয়। রিপোর্টারেরা যদি এই সব সাক্ষীদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করেন আমি তার কি করতে পারি?

বলা বাহুল্য, আমার এই জবাবে কর্তৃপক্ষ খুসী হ'তে পারেন নি। বলেছিলেন, অত্যন্ত অন্যায় এবং অশোভন ব্যাপার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, আমাদের দিক থেকে যথাসম্ভব সতর্কতা আমরা অবলম্বন ক'রে থাকি এবং ভবিষ্যতেও করব, কিন্তু রিপোর্টারদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা আমাকে সরকার দেননি', কাজেই আকারে ইঙ্গিতে আমায় leakageএর জন্য দায়ী করাও অনুরূপ অন্যায় এবং অশোভন।

চাঞ্চল্যের আসল কারণ এই যে রিপোর্টারের যে খবর বেরিয়েছিল তা' মোটামুটি সত্য ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার এবং দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তিনি ছিলেন সরকারের একজন পেটুয়া কর্মচারী। খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ডাঃ দাসের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিদ্বেষ-ভাব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, আগেই বলেছি leakage আমার দপ্তর থেকে হয়নি। তবে সরকার যদি মনে করেন খবরটা আগাগোড়া অথবা প্রধানতঃ বানানো, তাহ'লে সেই মর্মে তাঁরা অনায়াসে প্রেস্ নোট দিতে পারেন।

—প্রেসনোটএ যে কোন লাভ হবে না তা' আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সরকারী প্রেসনোটএ জনসাধারণের আস্থা খুবই কম।

—কিন্তু তা' ত হওয়া উচিত নয়, বিশেষ ক'রে যদি আমরা অর্থাৎ সরকার যদি জোরগলায় বলতে পারি যে খবরটা ভিত্তিহীন।

—ঐখানেই ত মুস্কিল। বাংলা দেশের পাব্লিকই যে সরকারের বিরুদ্ধে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ যে দেখছি ভয়ানক এক পরিস্থিতি। বাংলা দেশের পাবলিক্এর যদি সরকার সম্বন্ধে এতটুকু আস্থা না থেকে থাকে, সরকারী ইস্তাহারে যা' বলা হবে সেটা যদি তারা আগে

থেকেই মিথ্যাভাষণ এবং সাফাই-গাওয়ার নামান্তর বলে ধরে নেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে সরকারের রীতিনীতির মধ্যে গভীর গলদ রয়েছে।

দুঃখের বিষয় এই দিকটায় কর্তৃপক্ষের আদৌ নজর নেই। সরকারের কথা পাবলিক বিশ্বাস করে না কেন কর্তৃপক্ষ যদি একটু তলিয়ে দেখতেন, তাহ'লে বুঝতে পারতেন যে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পাবলিক্‌এর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারের ক্রমবৃদ্ধিমান্ ঔদাসীন্য।

আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল তার পরিবেষ্টনীতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করতাম পাবলিক এর সঙ্গে সংযোগ রাখতে। তাদের অভাব-অভিযোগ তদন্ত করা বিষয়ে আমি আমার সময় বা শক্তি ব্যয় করতে কখনও কার্পণ্য করিনি ব'লেই বোধ হয় জনসাধারণের আস্থা আমি যে পরিমাণে পেয়েছিলাম, খুব কমসংখ্যক সরকারী কর্মচারীর ভাগ্যে তা জুটে থাকে।

খবরের কাগজের roleএর কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ছে। রিপোর্টারেরা বাইরে থেকে মোটামুটি খবর সংগ্রহ করার পর অনেক সময়ই চেষ্টা করতেন আমার কাছ থেকে confirmation পেতে। এক বছর দুর্নীতি দমন বিভাগে থাকাকালে অনেক রিপোর্টারই আমাকে টেলিফোন্ করেছেন, জানতে যে—অমুক জায়গায় অমুক ব্যাপার হয়েছে বা অমুক কর্মচারী বা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আমরা দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছি বলে যে গুজব রটেছে, তা সত্যি কিনা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাকে বল্‌তে হয়েছে, আমাকে মাপ করবেন, সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি কোন কথা বলতে অসমর্থ। আমাদের আইনকানুন বলে যে এসব ব্যাপারে প্রেসের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখা অত্যন্ত নিয়মবিরুদ্ধ কাজ।

নাছোড়বান্দা একজন রিপোর্টার তবু বলেছেন, আমি আপনাকে কোন গোপনকথা প্রকাশ করতে বলছিনা, ডাঃ দাস। যা' জানবার তা'

আমরা আপনার সাহায্য না নিয়েই জেনেছি। আপনাকে শুধু প্রশ্ন করছি যা' জেনেছি তা' মোটামুটি সত্যি ত?

—হ্যাঁ বা না কোন কথাই আমি বলব না, কমলবাবু।

কমলবাবু অম্‌নি লুফে নিয়েছেন আমার এই সহজ, স্পষ্ট জবাব। বলেছেন, বুঝতে পেরেছি, স্যার। ব্যাপারটা তাহ'লে মিথ্যে নয়।

ব'লেই টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, যাতে আমি প্রতিবাদ করবার অবসরও না পাই।

সাময়িকভাবে বিরক্তিবোধ করলেও মনে মনে আমি কমলবাবুর এবং তাঁর মত আরও অনেকের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা না করে পারিনি'। কোন রিপোর্টার বা প্রতিনিধির সঙ্গে চাক্ষুষ কথা বলতে আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতাম বলেই বোধহয় তাঁদের এই জাতীয় কৌশলের আশ্রয় নিতে হ'ত।

চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর এঁদের কয়েকজন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, চাকুরীতে থাকা কালে আপনি ত আমাদের অস্পৃশ্যের মত এড়িয়ে চলতেন, ডাঃ দাস। এখন আশা করি আমরা আর অপাংক্তেয় থাক্‌বনা।

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, আপনারা fourth estate হ'লে কি হয়, আপনাদের ক্ষমতা আর তিন estateএর একত্রিত ক্ষমতার চেয়েও বেশী। তাই আপনাদের সর্ব্বদা ভয় ক'রে চলব।

সাতাশ

দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যাপারে প্রেসের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে অনেক সময় আমার রিপোর্টের উপর কর্তৃপক্ষ action নিতে বাধ্য হয়েছেন যখন প্রেসে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ যতদূর জানি, ডাঃ দাস তদন্ত ক'রে রিপোর্ট দিয়েছেন, কিন্তু সরকার কোন action নিচ্ছেন না

কেন?…ছু'জন পদস্থ অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল যখন খবরের কাগজে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল--তার আগে নয়। আরেকজন অফিসারকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ কর্‌তে হয়েছিল, প্রেসে আমার দপ্তরের রিপোর্ট নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল ব'লে।… আমি একথা বল্‌ছিনা যে প্রেসে আলোচনা না হ'লে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন থাক্‌তেন, কিন্তু এটাও সত্যি যে খবরের কাগজের আন্দোলন তাড়াতাড়ি একটা decision নিতে কর্তৃপক্ষকে অনেক সময়ই বাধ্য করেছে।…এই কারণে প্রেসের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।

প্রেসের খবরে অনেক সময় অতিরঞ্জন থাকে, এটা সত্যি। কিন্তু তার জন্য সরকার অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী! বাংলার মন্ত্রীপর্ষদ যদি প্রেসের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখেন এবং মাসে অন্ততঃ একটা প্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকেন, যেখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবার অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে, তাহ'লে প্রেসের সহযোগিতা তাঁরা আরও ভালভাবে পেতে পারেন। নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী যে জাতীয় প্রেস-কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করেন সেই জাতীয় কনফারেন্স কলকাতায়ও করা উচিত।

কিন্তু শুধু কন্‌ফারেন্‌স ডাকলেই প্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। কন্‌ফারেন্স শুধু পথপ্রদর্শক মাত্র। প্রেসের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেতে হ'লে যিনি কন্‌ফারেন্স address কর্‌বেন (সাধারণতঃ মুখ্যমন্ত্রী) তাঁকে হতে হবে অত্যন্ত কলাকুশলী। কোন প্রতিনিধি হয়ত ধৃষ্টতাসূচক প্রশ্ন করবেন। তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে সমূহ বিপদ। তাছাড়া সব সময় তাঁকে মনে রাখতে হবে যে প্রেসের পক্ষ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাব্‌লিক্‌এর প্রতিনিধি, মন্ত্রীপর্ষদের গুণগান না ক'রে তাঁর উচিত হবে পাব্‌লিক্‌এর অভাব অভিযোগের সন্তোষজনক এবং না-এড়িয়ে-যাওয়া জবাব দেওয়া। অথচ এই সাধারণ কথাগুলো অনেক মহারথীই ভুলে যান্‌।

ছুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা পেতে

হ'লে প্রতি দপ্তরে এমন একজন পদস্থ অফিসারকে নির্দিষ্ট করা দরকার যাঁর কাছে পাব্লিক্এর যে কেউ অভাব অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই অফিসারটিকে হতে হবে সততা এবং ধৈর্যশীলতার প্রতীক। তাঁর নিরপেক্ষতা নৈতিক সাহস এবং দৃঢ়তা বিষয়ে কারো যেন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। দপ্তরের অধিকর্তার তিনি হবেন দক্ষিণ-বাহু, দপ্তরের যে কোন বিভাগ পরিদর্শন কর্বার এবং কি ক'রে সেই বিভাগের কার্য পদ্ধতি সহজ ও দ্রুতগতি করা যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই অব্যাহত।

সরকারী অনেক দপ্তরে আজকাল পাব্লিক রিলেশন্স্ অফিসার নামে একজন কর্মচারীকে দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁদের পাবলিক রিলেশন্স্ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে সরকারী ইস্তাহার, প্রচারপত্র বা পুস্তিকা বিতরণে। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শান্তভাবে শোনাটাও তাঁরা সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করেন। এই জাতীয় পাবলিক রিলেশন্স্এ সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি ত হয়ই না, বরং সৃষ্টি হয় সরকারের দিক থেকে অভিমান (যে সরকারের সাধু প্রচেষ্টার মর্যাদা পাবলিক দিতে জানে না), আর জনসাধারণের দিক থেকে সঞ্চারিত হয় বিক্ষোভ (যে মুখে ডিমক্রেসীর বড়াই করলেও সরকার মনে মনে এখনও রয়েছে ঘোরতর ব্যুরোক্রাটিক)।

দুর্নীতিদমন বিভাগে আমার অভিজ্ঞতার কথা আবার বল্ছি। প্রেসের সঙ্গে যদিও কোন সংশ্রব আমি রাখিনি', জনসাধারণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। আগেই বলেছি, দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার নিয়েই আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে—যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্ আমি দেখা করতে প্রস্তুত আছি, এই সর্তে যে দুনীতির বিশদ খবর দর্শনপ্রার্থীকে দিতে হবে। আরও বলেছিলাম যে আমার দপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারী এবং সরকার

সংশ্লিষ্ট সংস্থানগুলোর নৈতিক আবহাওয়া উন্নত করা। এই কঠিন কাজে যদি খানিকটাও সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে আমাকে পেতে হবে পাবলিক্এর শ্রদ্ধা, তাদের প্রত্যয়।

আমি জানতাম যে বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু বৎসরব্যাপী (মুসলিম লীগ আমল থেকে এর সুরু হয়েছিল) সরকারী ঔদাসীন্য, সহানুভূতির অভাব দেখে দেখে এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, যে সরকারের কোন কর্মচারীর প্রতিশ্রুতিকেই তারা সীরিয়াস্‌ভাবে গ্রহণ করে না। তাই আমি আমার সংকল্প প্রচার করেই ক্ষান্ত হইনি', যতদূর সম্ভব তা কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল এই যে প্রথম কয়েক সপ্তাহের সংশয় (scepticism) কেটে যাবার পর আমার দপ্তরের কাজে পাবলিকএর কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব সহায়তা পেয়েছিলাম। আমার প্রতি দেশের অগুণতি নর-নারীর গভীর বিশ্বাস আমাকে দিয়েছিল অদ্ভুত একটা প্রেরণা, একটা শক্তি, যার উপর নির্ভর ক'রে আমি অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

পাবলিক্এর এই প্রত্যয় মাঝে মাঝে আমাকে রীতিমত অভিভূত করে ফেল্‌ত। তার দু' একটা টুকরো টুকরো অধ্যায় মনে পড়লে আজও কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ জলে ভরে আসে।

আটাশ

সরকারী দপ্তরে এবং সরকারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় দুর্নীতি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে খুবই আলোচনা চলেছে। লোকসভা, রাজ্যসভা, নানা প্রাদেশিক বিধানসভা—সর্বত্রই ঐ এক কথা, দুর্নীতির ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে সরকার যথোপযুক্ত অবহিত হচ্ছেন না। অনেকেই বল্‌ছেন যে নীতিজ্ঞানের অভাব যদি এভাবে বাড়তে থাকে

তাহ'লে দেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোকে বেশীদিন সুস্থ রাখা যাবেনা। এই কাঠামো যদি একদিন ভেঙ্গে পড়ে তাহ'লে ডিমক্রেসীর অবসান এবং ডিক্টেটরশিপএর অভ্যুদয় হওয়াও অসম্ভব নয়।

এর উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, বলা হয় যে বিরোধীদল অন্যায়ভাবে অতিরঞ্জন কর্ছেন। কোন কোন মহলে অল্পসল্প দুর্নীতি হয়ত রয়েছে, কিন্তু সরকারও ঘুমিয়ে নেই, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেছেন এবং কর্ছেন।

এর প্রমাণস্বরূপ সরকারী ইস্তিহারে প্রায়ই ফিরিস্তি দেওয়া হয়, স্পেশাল পুলিশদপ্তর অথবা দুর্নীতিদমন বিভাগ কতগুলো কেস্ তদন্ত করেছে এবং তদন্তের ফলে কতগুলো অফিসারের বিরুদ্ধে শাসনমূলক ব্যবস্থা (disciplinary action) অবলম্বন করা হয়েছে। ফিরিস্তি দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হ'বে, যা করণীয় সরকার যথাসম্ভব করছেন, এর বেশী আশা করা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে।

কিন্তু ফিরিস্তিগুলো একটু তীক্ষ্ণভাবে পর্যালোচনা কর্লে দেখা যাবে যে অধিকাংশ কেসেরই নায়ক হচ্ছেন চুনোপুঁটি মাছ। বড় বড় রুই কাৎলার দল স্পেশাল পুলিশ বা দুর্নীতিদমন বিভাগের জালে কিছুতেই পড়ছেন না। অথচ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও দুর্নীতি কম নয়।

যে একবছর আমি দুর্নীতিদমন বিভাগে সচিবত্ব করেছিলাম আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম এই শ্রেণীর লোকেদের দুর্নীতি এবং ব্যভিচার উদ্‌ঘাটন কর্তে। এই প্রচেষ্টায় আমি অনেক বাধা পেয়েছি, আমাকে ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে যদি এতটুকু বুদ্ধি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি যেন এঁদের ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামাই। কিন্তু বাধা আমাকে আরও বেশী সক্রিয় ক'রে তুলেছে, ভয়প্রদর্শনে আমি পশ্চাদপদ হইনি'।

বলা বাহুল্য, আমার অনেক রিপোর্টই কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি'। তাঁরা হয়ত মনে করেছেন, আমি যেন একটু বাড়াবাড়ি কর্‌ছি।

সত্যিকথা বল্‌তে কি, একটু বাড়াবাড়িই বোধ হয় আমি করেছিলাম। যাঁরা সাংসারিকবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরা এসব ক্ষেত্রে বল্‌বেন, কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সমাজের সব তুর্নীতি তোমাকেই দূর কর্‌তে হবে? Can't you let sleeping dogs lie? কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা একগুঁয়েমি ছিল (আমার গৃহিণী বলেন, এখনও রয়েছে) যে আমি কিছুতেই সহজ পথটা অনুসরণ কর্‌তে পারিনি'। এর ফলে চাকুরী জীবনে আমাকে অনেক তুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে।

মনে পড়্‌ছে, খবর পেলাম এক দপ্তরের অধিকর্তা টেণ্ডার বিলির সময় নানাপ্রকার অসাধুতা অবলম্বন কর্‌ছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেল যে ওঁর বিরুদ্ধে এর আগেও এই জাতীয় অভিযোগ এসেছিল এবং আমার দপ্তরের পূর্বতন সচিবেরা তদন্ত ক'রে তাঁকে benefit of doubt দিয়েছিলেন। বুদ্ধিমানের মত আমারও উচিত ছিল এই পথ অনুসরণ করা। কিন্তু আমি ব'লে বস্‌লাম যে ভালভাবে তদন্ত করতে চাই, এবং এজন্য অধিকর্তাকে অন্য কোন দপ্তরে সাময়িকভাবে বদলী কর্‌তে হবে, নইলে অধস্তন কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে মোটেই সাহস পাচ্ছেনা।...অধিকর্তা মহোদয়ের সে কি আস্ফালন! "ডাঃ দাসকে দেখে নেব, আমার মত একজন সুযোগ্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে এইপ্রকার অভিযোগ কর্‌ছেন, ধৃষ্টতা ত কম নয়!"

এই ভয় প্রদর্শনে আমি অবশ্য কাতর হ'লাম না এবং আমার দৃঢ়তা দেখে কর্তৃপক্ষ আমার নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌তে বাধ্য হ'লেন। পরে ব্যাপক তদন্ত করে আমি যখন অধিকর্তা-মহোদয়ের সমস্ত কীর্তিকাহিনী সরকারের সাম্‌নে উপস্থাপিত করেছিলাম তখন পর্ষদের একজন মন্ত্রী আমাকে অভিনন্দন

জানিয়েছিলেন যে অবশেষে এত বিরাট্ একটা দুর্নীতির আড্ডা আমি ভেঙ্গে দিতে পেরেছিলাম।

কিন্তু অনেকসময়ই আমি কোন অভিনন্দন পাইনি'। তার বদলে অনুভব করেছি এটা চাপা বিরক্তি, যে আমি শুধু শুধু অশান্তির সৃষ্টি করছি। অথচ, মুখোমুখি আমাকে প্রতিরোধ কর্‌বার মত সাহস কর্তৃপক্ষের ছিল না, কারণ তাঁরা জান্‌তেন যে fact সম্বন্ধে খানিকটা অন্ততঃ নিশ্চিত না হয়ে আমি কোন তদন্ত সুরু করিনা।

উনত্রিশ

দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে সরকারের স্বজনবাৎসল্য বা nepotism। আজ আমাদের দেশে শাসন-ব্যবস্থায় যে ফাটল ধরেছে তার পেছনে আছে এই nepotism এর বিরাট্ অনুস্মৃতি।

Nepotism অল্পবিস্তর সব দেশেই আছে, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষেও এর অভাব ছিলনা। কিন্তু ইদানীং এই ব্যভিচারটা যেন অস্বাভাবিকরূপে বেড়েই চলেছে। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে যাঁরা চাকুরী বা সরকারী অনুগ্রহ পান্‌না তাঁরাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই চার্জ আনেন, ভাবেন যে যাঁরা চাকুরী বা অনুগ্রহ পেয়েছেন তাঁরা সবাই কোন মন্ত্রী বা উচ্চ রাজ-কর্মচারীর আত্মীয় বা অনুগৃহীত।

সরকারপক্ষের এই উক্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবু আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে গত কয়েক বছরের মধ্যে দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে এবং সংস্থায় nepotism অসম্ভবরকম বেড়েছে। মাঝে মাঝে এর উপর অন্য আব্রু দেওয়া হয়, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই এই স্বজনপোষণ চল্‌তে থাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নগ্নভাবে।

পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসী এবং পার্টি গভর্ণমেণ্ট্‌এ খানিকটা nepotism অনিবার্য, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে যেখানে

নীতিজ্ঞান শিথিল হয়ে এসেছে সেখানে nepotism দুর্নীতি আরও বাড়ায়। একটা বিশেষ চাকুরী বা অনুগ্রহ দিলেই স্বজন পোষণের সমাপ্তি হয় না, যাঁকে চাকুরী বা অনুগ্রহ দেওয়া হয় তিনি স্বভাবতঃই মনে করেন যে তিনি বিভাগীয় আইনকানুনের উর্ধে, তিনি যদি কোন অন্যায়ও করেন তাঁকে কোন শাস্তি পেতে হবেনা। দুর্নীতিদমন বিভাগে কাজ করার সময় এবং তার আগে এই পরিস্থিতির অসংখ্য নিদর্শন আমার নজরে এসেছিল।

দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ কর্ছি। ঘটনা দুটোই আমার এই অধ্যায়ের বাইরে। আমি তখনও দুর্নীতিদমন বিভাগে আসিনি, বাংলা সরকারেরই অন্য দুই দপ্তরের সচিব আমি। তবু উল্লেখ কর্ছি, কারণ nepotism এর এমন সূক্ষ্ম প্রকাশ সচরাচর দেখ্তে পাওয়া যায় না।

প্রথম দপ্তরে একটা নতুন স্পেশালিষ্ট্ এর পদ সৃষ্টি করা হ'ল। সিদ্ধান্ত হ'ল যে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কাছে যাবার দরকার নেই, টেক্নিক্যাল পদ, এক টেক্নিক্যাল কমিটিই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হবে।

টেক্নিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হলেন একজন প্রবীণ আই-সি-এস্ অফিসার, আমি হ'লাম তার অন্যতম সদস্য। এ বাদে কমিটিতে নেওয়া হ'ল দু'জন বিশেষজ্ঞকে। প্রাথমিক বাছাই করার পর আমরা ইন্টারভিউএ ডাক্লাম পাঁচজন প্রার্থীকে। একজন বিশেষজ্ঞ মুখই খুল্লেন না বল্লে চলে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞটি প্রশ্নের পর প্রশ্নে প্রার্থীদের নাজেহাল ক'রে তুল্লেন। আমরা, অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞদ্বয়, খুসীই হ'লাম ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করার কায়দা দেখে।

অবশেষে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির কর্লাম যে প্রার্থী "ক" হচ্ছেন যোগ্যতম, নিয়োগপত্র তাঁকেই দেওয়া উচিত।

বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগপত্র দস্তখত কর্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় রেজিষ্টার্ড পোষ্ট্‌এ পেলাম একখানা চিঠি—প্রার্থী "গ" লিখেছেন। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি এইরূপ ঃ

"আমি আপনার দপ্তরের—পদের একজন প্রার্থী ছিলাম এবং কয়েকদিন আগে আপনার কমিটির সাম্‌নে উপস্থিতও হয়েছিলাম। অবশেষে কে মনোনীত হয়েছেন জানিনা, কিন্তু একটা বিষয় আপনার নজরে না এনে পার্‌লাম না। বিশেষজ্ঞ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন. আমার জবাব কতখানি সন্তোষজনক হয়েছিল বল্‌তে পারিনা, কিন্তু আমি প্রশ্ন কর্‌ছি, উনি কমিটিতে এলেন কোন্‌ আইন অনুসারে? আপনি কি জানেন না যে প্রার্থী "ক" ওঁর আপন ভাগ্নে? আপনি যে দপ্তরের সচিব সেখানেও কি এই জাতীয় স্বজনপোষণ চলে?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুণাক্ষরে আমাদের কাউকেই জান্‌তে দেন্‌নি যে প্রার্থী "ক" তাঁর অতিনিকট আত্মীয়। অথচ "ক"কেই আমরা নিয়োগ কর্‌তে চলেছি!

তখ্‌খুনি টেলিফোন কর্‌লাম ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম প্রার্থী "ক" সত্যি তাঁর ভাগ্নে কি না। খবরটা কোথা থেকে পেয়েছি সেটা অবশ্য গোপন ক'রে গেলাম।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা' মুহূর্তের জন্য। বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন, তাতে কি হয়েছে? আমার ভাগ্নে বলে বুঝি সে চাকুরীর যোগ্য হতে পারে না?

—নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু আমাদের কমিটির নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ হবে যে। বিধানসভায় এসম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ওঠে, কি জবাব দেব আমরা?

—কেন? বলবেন বিশেষজ্ঞ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী "ক" কে মনোনয়ন করেছেন!

—কিন্তু কমিটিতে যে মনোনীত ব্যক্তির মামা ছিলেন এবং তিনিই প্রধান বিশেষজ্ঞ!

—আপনি নিজেই ত দেখেছেন প্রার্থীদের মধ্যে "ক"ই ছিল সবচেয়ে সপ্রতিভ, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল সবচেয়ে নির্ভুল। আপনি নিশ্চয়ই suggest কর্‌ছেন না যে আমি তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলাম!

—আমি কিছুই suggest কর্‌ছিনা, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি শুধু বল্‌ছি এই যে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এর প্রতিকার কর্‌তে হবে আমাকে।

—কি প্রতিকার কর্‌তে চান্?···বেশ একটু রাগের সুরেই তিনি বল্‌লেন।

—নতুন ইন্টারভিউ কমিটি বসাতে হবে। প্রার্থীদের আবার ইন্টারভিউ কর্‌ব আমরা এবং এবার আমি আগে থেকেই সাবধান হব, কামটিতে কোন প্রার্থীর আত্মীয় যেন সদস্য না থাকেন।

—এতে কিন্তু আমাকে রীতিমত অপমান করা হবে, ডাঃ দাস।

—আমি নিরুপায়। আমি যে দপ্তরের সচিব সেখানে খানিকটা শালীনতা, খানিকটা নীতিপরায়ণতা বজায় রাখ্‌তে চাই। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তাহ'লে অনায়াসে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ কর্‌তে পারেন।

নতুন কমিটি বস্‌ল। এবার আমি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাক্‌লাম একজন অবাঙালী বিশেষজ্ঞকে, ভাব্‌লাম, সাবধানের মার নেই।

যা' ভেবেছিলাম তাই হ'ল। প্রার্থী "ক" এবার যোগ্যতা অনুসারে স্থান পেলেন তৃতীয়, আর প্রথম স্থান পেলেন প্রার্থী "গ", যিনি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রার্থী "ক" এর আত্মীয়তার কথা আমার নজরে এনেছিলেন।···যথাসময়ে প্রার্থী "গ" কাজে যোগ দিলেন।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ক্ষমা করতে পারেন্নি'। কর্তৃপক্ষের তিনি দক্ষিণ হস্ত, আমার বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা অনেক কিছুই তিনি বলেছিলেন, যার ফলে কিছুদিন পরেই আমি দেখতে পেলাম যে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাকে ডিঙিয়ে আমারই প্রাপ্য একটা পুরস্কার দেওয়া হ'ল আমার চেয়ে অনেক জুনিয়ার একজন অফিসারকে।

কিন্তু শিক্ষা আমার হল'না। দু'বছর পরে আবার ঘট্‌ল অনুরূপ এক ঘটনা। এবার প্রার্থী ছিলেন মাত্র একজন—সুদীর্ঘ অবসরভোগী প্রাক্তন অফিসার। আমারই দপ্তরে বহাল হতে চান্ উপদেষ্টা হিসেবে, মন্ত্রীমহলে তাঁর প্রচুর খাতির। আমি যদি তাঁর নামটা উপযুক্ত স্থানে পেশ ক'রে দিই তাহ'লে চাকুরীটা অনায়াসেই তিনি পেয়ে যান্।

—কিন্তু আমার যে কোন উপদেষ্টারই দরকার নেই, মিঃ কর।... আমি বল্‌লাম।

—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এত স্কীম্ তৈরী হয়েছে, এগুলো চালু কর্‌বেন কি ক'রে

—দপ্তরে কর্মচারীর অভাব নেই, মিঃ কর। অভাব হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে কাজ কর্‌বার ইচ্ছার। তাছাড়া আপনার বয়স হয়েছে, এখন কি আপনার পক্ষে এত পরিশ্রম করা সম্ভব হবে ?

—আমি ত আর মাঠেঘাটে যাব না, আমি সেক্রেটারিয়েটের এক কোণে বসে শুধু উপদেশ দেব।...আমি একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, আপনি এটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন্।

একটা দুর্বল মুহূর্তে মিঃ করের দরখাস্তখানা আমি গ্রহণ কর্‌লাম, কিন্তু তাঁকে বল্‌লাম যে আমার মতামত আমি নির্ভীকভাবে পেশ কর্‌ব।

"যথাস্থান" থেকে টেলিফোন এল ঃ দরখাস্ত আমার কাছে পাঠাবার কি মানে হয় যদি আপনি মনে করেন যে তাঁর জন্য আপনার দপ্তরে কোন স্থান নেই ?

তিরস্কারটা যুক্তিসঙ্গত। আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্‌লাম, মিঃ কর দরখাস্তটা আপনার নামে করেছিলেন, তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছি।

—কোন প্রয়োজন ছিলনা।...বল্‌লেন "যথাস্থান"।

কিন্তু অবশেষে যা' ঘট্‌ল তা' দেখেশুনে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সরকারী কাজে আমাকে দিন পাঁচেকের জন্য কল্‌কাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। যেদিন ফিরে এলাম আমার ডেপুটি সেক্রেটারী মুখ কাঁচুমাচু করে আমাকে বল্‌লেন, মিঃ করকে দপ্তরের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে, স্যার। উনি কাল কাজে যোগ দিয়েছেন।

—সে কি? কার হুকুমে?...প্রশ্ন করল্‌াম আমি।

—"যথাস্থান" এর্। অর্ডারটা আমি প্রথমে দস্তখত কর্‌তে চাইনি', কিন্তু জলে বসে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, স্যার, তাই দস্তখত করেছি। আমার অপরাধ নেবেন্ না।

বেচারী ডেপুটি সেক্রেটারীর কি অপরাধ? তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি সোজা ছুট্‌লাম "যথাস্থান" এর কাছে। চোখা চোখা কয়েকটা কথা তাঁকে ব'লে খানিকটা শান্ত হয়ে ফিরলাম আমার কামরায়।

সেদিন কাজে মন দিতে পারিনি'। মিঃ কর চাকুরী পেলেন কি না পেলেন সেটা বড় কথা নয়, আমাকে ডিঙিয়ে তিনি খোদ কর্তৃপক্ষের সাহায্যে চাকুরীটা পেয়েছেন সেটাও বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই যে সরকারের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা অম্লানচিত্তে এমন nepotism এর প্রশ্রয় দিচ্ছেন! অথচ তাঁরাই আশা করেন এবং বক্তৃতা দিয়ে থাকেন যে তাঁদের অধিনস্থ কর্মচারীবৃন্দ যেন নীরবে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের কর্তব্য করে যান্! একজন বিখ্যাত পলিটিক্যাল নেতার ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছা করে: Oh, the impudence of it!

ত্রিশ

স্বজন পোষণ ছাড়াও আরও অনেক সূক্ষ্ম (subtle) উপায় আছে, যার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর্ছি সরকারের বর্তমান নীতি যে সবাইকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করতে হবে, কিন্তু উপযুক্তক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার তাঁদের পুনর্নিয়োগ কর্তে পারেন ষাট বছর বয়স অবধি।

"উপযুক্ত ক্ষেত্র" এবং "রাষ্ট্রের প্রয়োজন" এই দুটো গালভরা কথা আপাতঃ দৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনেকক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার করা হয় "yes-men"দের আনুকূল্যে। ফল হয় এই যে normal চাকুরীজীবনেও অনেক অফিসার "yes-men" হতে চেষ্টা করেন, এই আশায় যে পঞ্চান্নোর্ধে তাঁদের ভাগ্যেও হয়ত একটা চাকুরী বা সরকারী অনুগ্রহ জুট্বে। এই পরিস্থিতিতে অফিসারদের পক্ষে নির্ভীকভাবে কাজ করা যে কত কঠিন তা' সহজেই অনুমেয়।

আজ যে কোন দপ্তরের (প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়) statistics নেওয়া হোক্ না কেন, দেখা যাবে যে উঁচু পদগুলোয় বেশ কয়েকটির মধ্যেই "রাষ্ট্রের প্রয়োজনে" পঞ্চান্নোত্তীর্ণ অফিসারেরা বসে আছেন। অথচ দ্বিতীয় বেতন কমিশন যখন সুপারিশ কর্ল যে রিটায়ারমেণ্টএর বয়স পঞ্চান্ন থেকে আটান্নয় বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সরকার তা' কিছুতেই গ্রহণ কর্লেন না। কারণ? রিটায়ারমেণ্টএর বয়স বাড়ালে জুনিয়ার অফিসারদের প্রমোশন পেতে দেরী হবে, সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে নতুন অফিসার নিয়োগ করার পথেও বাধা হবে। অথচ, অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই : পঞ্চান্নোত্তীর্ণ "yes-men"দের জন্য অনুরূপ (equivalent

নতুন পদের সৃষ্টি করা হচ্ছে, দপ্তরের সচিব বা অধিকর্তার সঙ্গে থাক্‌ছেন এক বা ততোধিক উপদেষ্টা (যথার্থ প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক), এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের জন্য-আলাদা ষ্টেনোগ্রাফার, পিয়নের পদ। জনসাধারণের পয়সার এমন অপব্যবহার প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে আমি কখনও দেখিনি'।

তবু আমি কোন আপত্তি তুল্‌তাম না যদি পঞ্চান্নোর্ধে পুনর্নিয়োগের নীতি ছোটবড় সকলের সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হ'ত। আই-সি-এস্ বা আই-এ-এস্ সচিব অথবা কোন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তা উপ-অধিকর্তা অবলীলাক্রমে পুনর্নিয়োগের অর্ডার পাচ্ছেন, কিন্তু বেচারী কেরানী বা ছোট অফিসারের ক্ষেত্রেই "রাষ্ট্রের প্রয়োজন"টা কমে আসে! স্বাধীন ভারতে এই বৈষম্য, এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমি অনেকবার প্রতিবাদ জানিয়েছি, অধিকাংশ সময়েই ফল পাইনি'।

মনে পড়ে, আমারই দপ্তরের একজন জুনিয়ার অফিসারের রিটায়ারমেণ্টএর বয়স এগিয়ে এসেছে, অফিসারটি এসে আমাকে জানালেন যে তাঁর একমাত্র ছেলে তখনও কলেজে, আর দু'টো বছর যদি তাঁকে চাকুরী করতে দেওয়া হয় তাহ'লে ছেলেটি তার শিক্ষা সমাপ্ত কর্‌তে পারে। সরকার ত এই প্রকার অনুগ্রহ অনেক বড় বড় অফিসারের ক্ষেত্রেই কর্‌ছেন, তাঁর ক্ষেত্রে এ অনুগ্রহ করাটা কি একেবারেই অসম্ভব ?

সোজা চলে গেলাম আমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টএ—যেখানে এইসব বিষয়ের প্রাথমিক বিবেচনা করা হয়। আমার বন্ধু, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট-এর সচিব, বল্‌লেন, ডাঃ দাস, আপনি ত জানেন পুনর্নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার জন্য নয়। এই অফিসারটি যদি আজ রিটায়ার করে যান তাহলে এঁর জায়গায় অনুরূপ অফিসার পেতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হবে না।

বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই আমি বল্লাম, আর অধিকর্তা শ্রীযুত বিমলকান্তি ধরকে যখন আপনারা উপদেষ্টা হিসেবে আরও দু'বছরের জন্য বহাল কর্লেন তখন বুঝি রাষ্ট্রের প্রয়োজনটা খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল ?

হাস্লেন আমার বন্ধু। বল্লেন, আমি নগণ্য অফিসার, রাষ্ট্রের প্রয়োজন কোন্ ক্ষেত্রে বেশী এবং কোন্ ক্ষেত্রে কম তা' চুলচেরা বিচার কর্বার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। এর বিচার কর্বেন মন্ত্রীপর্ষদ।

—আপনি অন্ততঃ আপনার ডিপার্টমেণ্ট-এর সম্মতিটা দিন্ না হয়। মন্ত্রীপর্ষদের সঙ্গে কথা বল্ব পরে।

—আগে ওখান থেকে সম্মতি আনুন, আমাদের দিক থেকে তখন কোন বাধা পাবেন না।

বলাবাহুল্য, শাসনযন্ত্রের জটিল কাঠামোর এক কোণে অবস্থিত এই নগণ্য অফিসারটির পুনর্নিয়োগের জন্য কেউই গা' কর্লেন না। আমি যখন এই কেস্-এর human aspectটা দেখবার জন্য কর্তৃপক্ষকে আবার অনুরোধ জানালাম, তখন তাঁদেরই একজন মন্তব্য কর্লেন যে এত বেশী বয়সে ভদ্রলোকের বাপ হওয়া উচিত হয়নি, অবিমৃষ্যকারিতার ফল এখন তাঁকে ভোগ কর্তেই হবে!

এই অফিসারটির ব্যাপারে যদিও আমি কৃতকার্য হইনি', তবু দু' একটি ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট আমার সঙ্গে তর্ক কর্তে কর্তে মাঝে মাঝে হয়রান হয়ে যেতেন, এবং আমাকে "খুসী" রাখবার জন্য কোন কোন কেস্-এ concede কর্তেন।

চাকুরী থেকে ইস্তফা দেবার পর আমার বন্ধু ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট-এর সচিবের কামরায় গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, আসুন, ডাঃ দাস। আপনার কথাই আলোচনা হচ্ছিল।

বল্লাম, আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ কর্ছি। তা' নিন্দা কর্ছিলেন, না প্রশংসা ?

—নিন্দা না প্রশংসা সেটা আপনিই বিচার কর্‌বেন। বল্‌ছিলাম, ডাঃ দাস যে ভাবে আমাদের browbeat কর্‌তেন এবং জোর করে আমাদের সম্মতি আদায় করে নিতেন তা' খুব কম সচিবই ক'রে থাকেন। ওঁর সঙ্গে আমরা সবসময় একমত হতে পারিনি', কিন্তু ওঁকে আমরা সত্যি miss করব।

ছ'হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লাম, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে আমি মাঝে মাঝে browbeat করেছি, এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আমি কল্পনা করতে পারি না।...সরকারী কর্মশালা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এসময় আপনাদের উপদেশ দেওয়া হয়ত ধৃষ্টতা। তবু অনুরোধ করব, নিয়মকানুনগুলো নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ কর্‌বেন এবং অধস্তন কর্ম্মচারী এবং কেরাণীদের ছুরবস্থার কথা একটু মনে রাখবেন। হাজার হোক্, তারাও মানুষ।

একত্রিশ

সরকারের নানা প্রতিষ্ঠানে যে ছুর্নীতি রয়েছে তা' প্রত্যেক ভুক্তভোগীই জানেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ই তা' স্বীকার কর্‌তে চান্‌না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে নিম্নস্তরের পুলিশের মধ্যে ছুর্নীতি, রেল দপ্তরের বুকিং বিভাগে (প্যাসেঞ্জার এবং পার্শেল উভয়তঃ) ছুর্নীতি, আদালতের পেয়াদা পেস্কারদের মধ্যে ছুর্নীতি। কিন্তু ছুর্নীতির উল্লেখেই সরকার কেমন যেন allergic হয়ে উঠেন !

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই allergy-র একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি তখন সবেমাত্র ছুর্নীতিদমন বিভাগের ভার গ্রহণ করেছি। আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন নয়াদিল্লীর Indian Institute of Public Administration-এর একজন পদস্থ কর্মচারী, বল্‌তে যে তাঁদের Institute-এর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় যদি আমি একটি প্রবন্ধ লিখি তাহলে তাঁরা খুব অনুগৃহীত হবেন।

আমি প্রথমে ইঐ অনুরোধ এড়িয়ে যেতে চাইলাম। বললাম, আমার সময় নেই।

—না, ডাঃ দাস, ওসব ওজর আমরা শুনব না। আপনি ত নানা পত্রিকায় লেখা দেন্, আমাদের Institute কি অপরাধ করল? আপনার এতদিনের সরকারী জীবনের অভিজ্ঞতার যে কোন অধ্যায় নিয়ে লিখতে পারেন, কোন বাঁধাধরা নিয়মে আপনাকে চলতে হবেনা।

—জানেন ত, আমি আবার একটু স্পষ্টভাষী। কি লিখে বস্‌ব, আপনাদের হয়ত মনঃপূত হবেনা।

—সে ভয় করবেন না. ডাঃ দাস। আমাদের Institute ত সরকারের দপ্তর নয়, আমরা হচ্ছি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের পত্রিকায় যাঁরা লেখেন তাঁরা তাঁদের নির্ভীক মতামতই ব্যক্ত ক'রে থাকেন। পত্রিকার মুখবন্ধে তাই আমরা লিখে দিই যে প্রবন্ধগুলোয় যে সব কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সরকার বা Institute একমত এমন যেন কেউ মনে না করেন।

—আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌ব।···আমি জবাব দিলাম।

নয়াদিল্লীতে ফিরে গিয়ে ভদ্রলোক আবার চিঠি লিখ্‌লেন। "আমার অনুরোধ আশা করি আপনার মনে আছে। আপনার পছন্দমত যে কোন বিষয়ে লিখ্‌তে পারেন, প্রবন্ধটি administraticn সংশ্লিষ্ট হ'লেই হ'ল। আমাদের বিশেষ সংখ্যা প্রেসে যাচ্ছে ৩১শে মার্চ তারিখে, তার আগে যেন লেখাটি পাই।"

ততদিনে দুর্নীতিদমনবিভাগে আমার মাস চারেকের মত অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভাব্‌লাম, আমার এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যদি লিখি তাহলে দেশের হয়ত উপকার হতে পারে। "Integrity in Public Administration" এই নাম দিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ পাঠালাম Institute এর সম্পাদকের কাছে—deadline (৩১শে মার্চ) এর বেশ কয়েকদিন আগেই।

ছু'সপ্তাহ, তিনসপ্তাহ কেটে গেল, ওদিক থেকে কোন উচ্চ বাচ্য নেই। পরপর ছুটো reminder পাঠালাম।

অবশেষে জবাব এল, আমার প্রবন্ধ ওঁরা যথাসময়ে পেয়েছেন, কিন্তু কতকগুলো "technical" অসুবিধার জন্য প্রবন্ধটি সম্পাদক পরিষদের "বিবেচনাধীন", তাঁদের স্থিরসিদ্ধান্ত আমাকে শীঘ্রই জানানো হবে।

ভীষণ রেগে গেলাম আমি। "Technical" অসুবিধা? সম্পাদক পরিষদের "বিবেচনাধীন"?

সম্পাদকপরিষদের কর্তা তখন কেন্দ্রীয় দপ্তরের স্বরাষ্ট্রবিভাগের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী, আমারই সতীর্থ আই-সি-এস্ অফিসার।

সরাসরি তাঁর কাছে লিখলাম আমি। বল্‌লাম, লেখাটি আমি পাঠিয়েছিলাম তাঁদেরই সনির্বন্ধ অনুরোধে। কি "techniacl" অসুবিধা হচ্ছে জানিনা, তবে মনে হচ্ছে আমার লেখাটা কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি ঃ সরকারের কোন কোন মহলে যে ছুর্নীতি রয়েছে এবং চেষ্টা কর্‌লে তা' কমানো যায়, এটা তাঁরা মান্‌তে রাজী নন্। এসম্বন্ধে তর্ক কর্‌তে চাই না, তবে এই সর্ববাদিসম্মত কথাটাও যদি Institute এর কর্তৃপক্ষের কাছে অশোভন মনে হয়ে থাকে তাহ'লে তাঁরা যেন দয়া করে লেখাটি ফেরৎ পাঠান। ডাঃ দাসের লেখা Institute-এর পত্রিকার চেয়ে উচ্চাঙ্গের অনেক পত্রিকার সম্পাদকই সানন্দে গ্রহণ কর্‌বেন।

এর উত্তরে জবাব এল, জয়েন্ট সেক্রেটারী শীগ্‌গীরই অন্যকাজে কলকাতায় যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে মুখোমুখি এসম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বেন।

জয়েন্ট সেক্রেটারী কল্‌কাতায় এলেন খবর পেলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লেন না। কারণ অবশ্য আমি বুঝ্‌লাম: আমার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা কর্‌বার মত সাহস তাঁর নেই।··· সাহসের এই জাতীয় অভাব আমি আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।

সপ্তাহ দুই পরে আমি আবার লিখ্‌লাম জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে। এবার জবাব এল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে সময়ের অভাবে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় দেখা কর্‌তে পারেন্‌নি'। যাই হোক্‌, লেখাটি তাঁরা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বেননা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেটি ফেরৎ পাঠাচ্ছেন।

আমি জবাব দিলাম, তাঁর দুঃখে আমিও দুঃখিত। তবে আমি খুসী বোধ কর্‌ছি এইজন্য যে তিন-চার মাস দেরী হ'লেও অবশেষে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন!

মাসকয়েক পরে এই লেখাটি প্রকাশিত হ'ল কলকাতার বিখ্যাত কমার্শিয়াল পত্রিকা "Capital" এর বার্ষিক বিশেষ সংখ্যায়। আমার বন্ধু-বান্ধব এবং সতীর্থ যাঁরাই এই লেখাটি পড়্‌লেন (লেখাটির ইতিহাস অনেককেই আমি বলেছিলাম) তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন, কেন Institute of Public Administration এই অত্যন্ত নির্দোষ লেখাটি প্রকাশ কর্‌তে রাজী হন্‌নি'। লেখাটিতে দুর্নীতির জন্য দায়িত্ব আমি কেবল সরকারের উপর চাপাইনি', চাপিয়েছিলাম দেশের লোকের উপরেও, দায়ী করেছিলাম কতকগুলো জড় আইন কানুনকেও।

এই Institute of Public Administraton সম্বন্ধে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের Times of India কাগজে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাই নিয়ে সম্পাদকের কাছে অনেক চিঠিপত্রও আসে। আমার অভিজ্ঞতার চুম্বক সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলাম— আমার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল Times of Indiaর ২৮শে এপ্রিল সংখ্যায়। বলা বাহুল্য, আমার চিঠির কোন প্রতিবাদ Institute এর পক্ষ থেকে আসেনি'। আস্‌বেই বা কি ক'রে? আমি ত মনগড়া কোন কথা বলিনি'—প্রত্যেকটি উক্তির লিখিত প্রমাণ আমার কাছে এখনও রয়েছে

বত্রিশ

দুর্নীতি কি ক'রে দূর করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই দেশে হচ্ছে এবং মতবিরোধও কম দেখা যাচ্ছেনা। শ্রীযুত চিন্তামন্ দেশমুখ বল্‌ছেন, ট্রাইবুন্যাল বসানো দরকার, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত নেহরুর তাতে ঘোরতর আপত্তি, তাঁর মতে ad-hoc কমিটির মাধ্যমেই অনুসন্ধান চল্‌তে পারে, পরে যদি কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে specific charges পাওয়া যায় তখন না হয় ট্রাইবুন্যালের কথা ভাবা যাবে।

আমার মতে, ট্রাইবুন্যাল-বনাম-কমিটি এই তর্ক নিতান্তই নিরর্থক। প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যে, অনুসন্ধানের ভার দিতে হবে এমন একজন বা একাধিক লোককে যাঁরা নির্ভয়ে, কর্তৃপক্ষ কি মনে কর্‌বেন সে ভাবনা দূরে রেখে, কাজ কর্‌তে পারবেন। সরকারের executive এবং legislative এই উভয় শাখা থেকে এঁদের হ'তে হ'বে সম্পূর্ণ পৃথক্, কোন পার্টির আওতায়ও এঁরা আস্‌বেন না। আর, প্রাথমিক তদন্তের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করার যদি প্রয়োজন থাকে তাহ'লে আমাদের দেশেও ডেনমার্ক এর বিখ্যাত Ombudsmand বা Grievance Man এর পদের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এই Ombudsmand বা Grievance Man এর একটু বিশদ্ ব্যাখ্যা দরকার। আজকের দিনে যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নানা দিকে বেড়েই চলেছে, বুরোক্রেসীর নিষ্ক্রিয়তা এবং red-tapism দুর্নীতির সহায়ক। তাই ডেন্‌মার্কএ সৃষ্টি করা হয়েছে এই Ombudsmand বা Grievance Man এর পদ : এঁর কাজ হচ্ছে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শোনা এবং প্রত্যেকটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে তা' দূর কর্‌তে চেষ্টা করা। অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি এবং প্রত্যেকটি দপ্তরের অধিকর্তা তাঁর নির্দেশ সশ্রদ্ধভাবে বিবেচনা

কর্‌তে বাধ্য। এই সংস্থায় ডেন্‌মার্ক এর শাসনযন্ত্রে red-tapism এবং তুর্নীতি খুবই কমে এসেছে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে যে, যে ট্রাইবুন্যাল বা কমিটিকে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হবে তাকে অনেকটা পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের মত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ, তাঁরা যে নির্দেশ দেবেন কর্তৃপক্ষকে তা' গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তা' গ্রহণ কর্‌তে না পারেন, তাহ'লে কারণটা লিখে জানাতে হবে এবং বছরে অন্ততঃ একবার এই সব কেস্‌এর (যেখানে কর্তৃপক্ষ ট্রাইবুন্যাল বা কমিটির নির্দেশ গ্রহণ কর্‌তে পারেন্‌নি') একটা তালিকা উপস্থাপিত কর্‌তে হবে লোকসভায় বা সংশ্লিষ্ট বিধানসভায়, যাতে সদস্যগণ বিচার কর্‌তে পারেন, কর্তৃপক্ষের এই অস্বীকৃতি কতদূর যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

তৃতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, সরকারের কর্মপদ্ধতির মধ্যে খানিকটা সরলতা, সাবলীলতা নিয়ে আসা। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় এমন অনেক আইনকানুন বিধিব্যবস্থা রয়েছে যা' কাজের সহায়তা ত করেই না, বরং বাধার সৃষ্টি করে এবং তুর্নীতির আশ্রয় নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রলুব্ধ করে। এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে এই সব কর্মপদ্ধতি সহজ ও সরল করা আজ নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে যে, জনসাধারণকে হতে হবে সচেতন, সক্রিয় এবং ভয়শূন্য। সরকার ট্রাইবুন্যালই বসান্‌ আর redtapeই দূর করুন, তুর্নীতি কিছুতেই যাবে না যদি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ বদ্ধপরিকর না হন্‌ যে তাঁরা কিছুতেই তুর্নীতির প্রশ্রয় দেবেন না। আমি জানি, এই উপদেশ মান্‌তে হলে আমাদের এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে অনেক প্রার্থী ও ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সমবেত চেষ্টায় তুর্নীতি যদি উচ্ছেদ করা যায় তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আরও বড় ক্ষতির হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন।

গত দেড় বছরের মধ্যে আমার এই মতামত Statesman এবং অন্যান্য দু'একটি সংবাদপত্রের মারফতে আমি কর্তৃপক্ষের সম্মুখে পেশ করেছি। আমি এও জানি যে তাঁদের অনেকেই আমার diagnosis এবং cure সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে further action ধামাচাপা পড়ে যায়, সংশ্লিষ্ট স্বার্থ (vested interests) এসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আই-সি-এস্ থেকে বিদায় নেবার পর একবার রাইটার্স বিল্ডিংস্এ গিয়েছিলাম বাংলা মন্ত্রীপর্ষদের দু'একজনের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের একজনের সঙ্গে যে বাক্য বিনিময় হ'ল তারই একটু আভাস দিচ্ছি।

—Statesmanএ আপনার লেখা পড়্লাম, ডাঃ দাস। আপনি যা' বলেছেন তা' খুবই সমীচীন।

—সমীচীন যদি মনে করেন তা'হলে তা' কাজে লাগান না কেন? আমি আরও বিশদ্ একটা note আপনাদের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারি, যদি আশ্বাস দেন্ যে সেটা ওয়েষ্ট্ পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া হবেনা অথবা আপনাদের সরকারী archivesএর প্রকোষ্ঠে docketed এবং filed হয়ে থাক্বে না।

—মন্ত্রীপর্ষদে আমার মতামত ত গ্রাহ্য হয় না, ডাঃ দাস। আমি একা কি করে আপনাকে গ্যারান্টি দিই যে শেষপর্যন্ত আপনার note এর উপর action নেওয়া হবে?

অনেক মন্ত্রীর কাছ থেকেই এই অসহায়তার অজুহাত আমি শুন্তে পেয়েছি। প্রশ্ন করি, নিজেদের যদি এতই অসহায় মনে করেন তাহ'লে তাঁরা আসন আঁক্ড়ে বসে রয়েছেন কেন? কেন তাঁরা জোরগলায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন না?

বাংলাদেশের সাধারণ নরনারীর সংস্পর্শে আস্বার, তাঁদের অভাব-অভিযোগ জান্বার, সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আই-সি-এস্ এর বর্ম

আমাকে কোনদিনই তাদের কাজ থেকে আলাদা করে রাখ্‌তে পারেনি'। তাদের চিন্তাধারার খানিকটা খবর আমি রাখি। তাদের হয়ে আমি সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, সরকার যেন এই দুর্নীতি বিষয়ে আর একটু বেশী অবহিত হন্।

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে যাঁরা সরকারের yes-men তাঁরাও কর্তৃপক্ষের এই ঔদাসীন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাঁদেরও অনেকে চান্, সরকার যেন সমাজবিরোধী লোকের নির্লজ্জ লাভ-লোভ এবং দুর্নীতির দুষ্ট-বৃত্ত-রচিত কুকীর্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

কিন্তু মহাদেব যে এখনও ধ্যানমগ্ন!

তেত্রিশ

দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব, আই-সি-এস্‌এ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, ডাঃ দাসও যে অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারেন্‌নি তারই একটা গল্প বল্‌ছি।

সেদিন ছিল বর্ষাচ্ছন্ন মুখর রাত। কল্‌কাতার নানা রাস্তায় জল জমে গেছে, দক্ষিণ কল্‌কাতায় ট্রাম চলাচল বন্ধ, বাসগুলোও কোনরকমে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে চলেছে। আমি বাড়ীতে বসে আফিসের ফাইল ঘাঁট্‌ছি।

হঠাৎ শুনি নীচে একটা প্রকাণ্ড সোরগোল। একটি মেয়েমানুষের কান্না এবং আমার পুরানো বেয়ারার ধমক।

—সাহেব এখন কাজ কর্‌ছেন। তোমার কি দরকার না বল্‌লে তোমাকে ওপরে যেতে দেওয়া হবেনা।

—তোমার পায়ে পড়ি তোমার সাহেবকে খবর দাও। আমার কথা আমি সাক্ষাতে তাঁর কাছে বল্‌ব।

চেঁচামেচি শুনে আমি বেয়ারাকে ডাক্‌লাম। প্রশ্ন কর্‌লাম, মেয়েটি কে?

—আশেপাশেরই বস্তির কোন মেয়ে হবে, হুজুর। বল্‌ছি এখন দেখা হবে না, তবু শুন্‌ছে না।

—ওকে বস্‌তে বল। আমি আস্‌ছি।

রাগে গজ্‌গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে বেয়ারা চলে গেল।

আঠারো উনিশ বয়স হবে মেয়েটির, নাম লীলা। কাছেই উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকে, তার এক দূর সম্পর্কীয় পিসেমশায়ের বাড়ীতে। ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি উঠেছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে পড়া চালাতে পারেনি, ম্যাট্রিক পরীক্ষাও দেওয়া হয়নি'।

পিসেমশায় বার্ধক্যে প্রায় অকর্মণ্য বল্‌লেই চলে। খোলার ঘরের দাওয়ায় সামান্য পানবিড়ির দোকান করেন। বাড়ীতে কোন বয়স্ক ছেলে নেই, পিসীমার একটি ছেলে জগদ্দলের দিকে কোন্‌ এক কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহান্তেও একবার বাড়ীতে আসেনা, উপার্জনের প্রায় সবটাই খরচ করে নিজের আমোদ-প্রমোদে এবং নেশায়। ফলে সংসার চালাবার ভার এসে পড়েছে লীলার ওপর।

অনেকের হাতে পায়ে ধরে সে এক নারীকল্যাণ আশ্রমে একটা চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন চাকুরী করেই সে বুঝতে পেরেছে যে বাইরের ভদ্র আবরণের পেছনে অত্যন্ত কুৎসিৎ ব্যাপার চলেছে। তবু সে চাকুরী ছেড়ে দিতে সাহস করেনি', কারণ তাহ'লে সংসার অচল। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে।

কিন্তু কয়েকদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে যে সেক্রেটারী যতীন্‌বাবু যেন একটু লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছেন। আশ্রমের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্‌ কাদম্বিনী দেবীর কাছে সে একথা বলেছিল, তিনি ধমক দিয়ে বলেছেন যে, যে মেয়ে সৎপথে থাক্‌তে চায় তাকে কেউ বিপদে ফেল্‌তে পারে না।

তারপর আজ সন্ধ্যার একটু পরে যতীনবাবু লীলাকে ডেকে

ছিলেন আশ্রমের আফিস ঘরে। তাকে প্রকারান্তরে বলেছেন যে সে যদি তার চাকুরী বজায় রাখ্‌তে চায় তাহ'লে তাকে যতীন্‌-বাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে হাজিরা দিতে হবে। এবং এও বলেছেন যে তিনি আশা করেন লীলা আজ রাত দশটার পর তার ওখানে যাবে।

—আপনি আমাকে বাঁচান, বাবু।...অশ্রুকলঙ্কিত মুখে লীলা বল্‌ল।...আমাদের কলোনীতে সবাই আপনার কথা বলে। আপনি যদি যতীন্‌বাবুকে একটু ধমক দিয়ে দেন্‌ তাহ'লে তিনি আমার পেছনে আর লাগবে না।

—কিন্তু যতীনবাবুর স্ত্রীর ছেলেপুলে নেই?... আমি প্রশ্ন কর্‌লাম।

লীলা ঘাড় নেড়ে বল্‌ল যে এসম্বন্ধে সে কোন খবরই রাখে না।

তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম লীলার দিকে। কাহিনীটার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, তবে আমার পঁচিশ বছরের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনেকসময় এজাতীয় অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু লীলার চোখ দেখে বুঝ্‌লাম সে এতটুকু বানিয়ে বলেনি'।

—তুমি এতই ভয় পেয়েছ যে এই দুর্যোগের মধ্যে ছুটে এসেছ? আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যতীনবাবু তোমার কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বেন না।

লীলা কতখানি ভরসা পেল জানিনা। শুধু বলল, আজ আমি বাড়ী যাব না, এখানেই থাকব।

আমি প্রমাদ গুণ্‌লাম। আমার গৃহিনী যতই উদার হোন্‌ না কেন, লীলার এই বাড়াবাড়ি কিছুতেই সহ্য কর্‌বেন না। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি বাড়ীতে নেই, আমার সংসারের ঝামেলা থেকে জিরোবার জন্য গেছেন বাপের বাড়ীতে। কিন্তু ফিরে এসে আমার বেয়ারার কাছে যখন শুন্‌বেন, তখন?

বল্‌লাম, এখানে তোমার থাকা চল্‌বেনা, লীলা। আমার বেয়ারা তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় লীলা উঠ্‌ল।

বেয়ারা ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ঠিকমত পৌঁছে দিয়ে এসেছ ত?

জলেকাদায় ভিজে বেয়ারার মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল না। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল, আমি আবার কোথায় পৌঁছে দেব? হন্‌হন্‌ করে সে নিজেই কলোনীর একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল, এবং আমাকে বল্‌ল, তুমি যেতে পারো। আমি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম।

বল্‌লাম, ঠিক আছে।

পরের দিন অফিস যাবার পথে লীলার বর্ণিত সেই নারীকল্যাণ আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'লাম। প্রথমে চাইলাম যতীন্‌বাবুকে। অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—কাকে চাই?

—যতীন্‌বাবুকে। যতীন্‌ দত্ত।

—আমিই যতীন্‌ দত্ত।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। কোথায় বস্‌তে পারি?

ব'লে আমার পরিচয় দিলাম।

দেখ্‌লাম, যতীন্‌বাবুর মুখখানা কেমন যেন শাদা হয়ে গেল।

ভেতরে এসে কোনপ্রকার ভণিতা না করে তাঁকে জানালাম লীলার অভিযোগ। জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বল্‌লাম, আপনি যদি লীলার পেছনে এভাবে লাগেন তা'হলে চাকুরী যাবে আপনার, লীলার নয়। তাছাড়া একজন মহিলাকে বেইজ্জত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন এই অপরাধে আপনাকে জেলের অতিথিও হ'তে হবে।

বোকার মত যতীন্‌বাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, লীলা আপনাকে এসব বলেছে ?

গরমস্বরে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, লীলা বলেছে এবং তার কথা অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

—কিন্তু লীলা যে আমার স্ত্রী, স্যার।

আমার মেজাজ তখনও গরম। বল্‌লাম, ওসব ধাপ্পায় ডাঃ দাস ভোলেন্‌ না। আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লীলাকে বিরক্ত কর্‌বেন না।

যতীনবাবু হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে ডাকলেন, দিদি, ওদিদি! একবার এদিকে আসুন ত!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কৃশাঙ্গী শাদা থান কাপড় পরা একজন বৃদ্ধা মহিলা। পলকের মধ্যে তাঁকে চিন্‌লাম। তাঁকে বহুদিন থেকে জানি, তাঁর সাধুতা, নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম।

—তারপর, নবগোপাল, এখানে কি মনে করে ?

—আপনি কি এখানেই থাকেন না কি ?

—হ্যাঁ, আমিই ত এখানকার সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্‌।...যতীনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ত ? ও হচ্ছে আমার ডান হাত। আমার সেক্রেটারী হিসেবে ওকে না পেলে আমার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হ'ত।

ব'লে সপ্রশংসভাবে যতীনবাবুর দিকে তাকালেন তিনি। যতীন্‌-বাবু রীতিমত লজ্জিতবোধ কর্‌লেন।

—দিদি, লীলা গতকাল ডাঃ দাসের কাছে গিয়েছিল, আমার বিরুদ্ধে নানা নালিশ করে এসেছে।...ডাঃ দাস কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌ছেন না যে লীলা আমার স্ত্রী। আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন না!

কাদম্বিনী দেবীকে আমি বল্‌লাম আগের দিন রাতের কাহিনী।

কাদম্বিনী দেবী হেসে বল্‌লেন, এই ত ? এটা হচ্ছে লীলার নতুন

পাগ্‌লামি। আমি বল্‌ছি, লীলা যতীনের বিবাহিতা স্ত্রী। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়েছি।

স্তম্ভিতভাবে শুন্‌লাম লীলার ইতিবৃত্ত। এই আশ্রমেরই মেয়ে সে, এখানে এসেছিল তিন-চার বছর আগে। আশ্রমের অন্যান্য মেয়েদের মত তারও একটা অপ্রীতিকর পূর্ব-ইতিহাস ছিল, তবে সে খুবই চেষ্টা কর্‌ছিল লেখাপড়া শিখে আত্মনির্ভর হ'তে।...তারপর হঠাৎ সে যতীনের প্রেমে পড়ে, যতীনেরও তাকে ভাল লাগে। কাদম্বিনী দেবীকে যতীন্ গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করে, তাঁরই উপদেশে বা আদেশে লীলাকে বিয়ে করে, সে আজ মাস পনেরো হবে।

বিয়ের কিছুদিন পরেই লীলার এই নতুন ব্যাধি দেখা দেয়। আর কিছুই নয়—মাঝে মাঝে তার ধারণা জন্মায় যে যতীন্ তার স্বামী নয়, যতীন তাকে অন্যায়ভাবে বেইজ্জত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। একবার সে এই আশ্রমের অফিসে এসে সকলের সাম্‌নে একটা বিশ্রী সীন্ করেছিল। বেচারী যতীন্ ত লজ্জায় লাল, কিন্তু হাজার হোক্ লীলা তার স্ত্রী, কি সে কর্‌তে পারে? যতীনের ধৈর্যের (ধৈর্যের কেন, স্নেহের) প্রশংসা না করে পারা যায় না। কোন উত্তাপেই সে উত্তপ্ত হয় না, বিশেষ করে যেখানে লীলা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। লীলাকে সে সত্যি ভালবাসে, বিয়ের পর লীলার এই অদ্ভুত ব্যবহারে যতীনের ভালবাসা যেন আরও গভীর, আরও অন্তঃসলিল হয়ে উঠেছে।

—তুমি যদি চাও আমি লীলার কাছে এখ্‌খুনি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। খুবসম্ভব এতক্ষণে সে তার সাময়িক পাগ্‌লামি কাটিয়ে উঠেছে

বল্‌লাম, না, কোন প্রয়োজন নেই।

তারপর যতীনবাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। বুঝতেই ত পার্‌ছেন, এরকম নালিশ কোন মেয়ে যদি আমার কাছে করে তাহ'লে সে সম্বন্ধে আমাকে অনুসন্ধান কর্‌তেই

হয়। তবে আপনার কথাটা না শুনেই একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াটা আমার উচিত হয়নি'। আমাকে ক্ষমা করবেন।

আরও বিব্রতবোধ করলেন যতীন্‌বাবু। বললেন, না, না, আমি কিছু মনে করিনি', ডাঃ দাস।

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে আস্‌বার পথে গাড়ীতে বসে কেবলই মনে হচ্ছিল, জীবনে অভিজ্ঞতাঅর্জনের শেষ বোধ হয় কখনও হয় না। আমার দম্ভ এক মুহূর্তে চূরমার করে দিয়েছে এই লীলা-যতীন্ সম্পর্কীয় ঘটনা!

লীলার এই schizophreniaর একটা সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু মনঃ—সমীক্ষণ (psycho-analysis) আমার পেশা নয়। সব রহস্যের আবরণই যে আমাকে উন্মোচন করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

চৌত্রিশ

মাত্র এক বছর আমি দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম এবং এই দপ্তরের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিল আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি দেখ্‌লাম যে আগ্রহ এবং দৃঢ়তা থাক্‌লে এই বিভাগে জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার করা যায় তখ্‌খুনি আমার অসন্তোষ কেটে গিয়েছিল।

দপ্তরটা নতুন নয়। স্বাধীনতা লাভের এক বছর আগে থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং সচিবের পদ প্রায় সব সময়ই অধিকার ক'রে এসেছেন আমারই মত একজন আই-সি-এস্ অফিসার। কিন্তু ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের আগে পর্যন্ত এই দপ্তরের অস্তিত্বের খবরও অনেকে জান্‌তনা। অথচ মাত্র এক বছরের মধ্যে এই দপ্তরের কর্মতৎপরতা দেখে শুধু বাংলাদেশে কেন, বাংলার বাইরেও অনেকে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই পরিবর্তনের জন্য আমি নিজে অনেকখানি দায়ী। চাকুরী-জীবনের প্রথম দিন থেকেই আমার বিশ্বাস যে, আমরা অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দেশের সেবা কর্‌তে পারি মাত্র এক উপায়ে, সে হচ্ছে নির্ভয়ে, এবং ব্যবহারিক (material) পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে, কাজ ক'রে যাওয়ায়। এই নীতি সম্পূর্ণভাবে আমি অনুসরণ করেছিলাম দুর্নীতিদমন বিভাগে।

সরকারী যে কোন দপ্তরে বাঁধাধরা অনেক আইনকানুনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাজ কর্‌তে হয়। দুর্নীতিদমন বিভাগের কাজে এই আইনকানুনের বাধা একটু বেশীই ছিল। তবু যে আমি খানিকটা সাফল্য লাভ কর্‌তে পেরেছিলাম তার প্রধান কারণ, আমি কখনও ভীরু মন নিয়ে আমার অনুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হইনি'। অনেক কেস্ আমাকে তদন্ত কর্‌তে হয়েছে যেখানে অভিযুক্ত ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারের সুদক্ষ কর্মচারী বা প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু আমি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইনি'।

বলা বাহুল্য, আমাকে নানা অসুবিধায় পড়্‌তে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বার্থ (vested interests) পদে পদে আমার অনুসন্ধানকে ব্যর্থ কর্‌তে, চেষ্টা করেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে আমার high-handedness এবং বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে অনেক নালিশও করা হয়েছে। দু'এক সময় কর্তৃপক্ষের মধ্য থেকেই আমার শুভানুধ্যায়ীরা বলেছেন, আমি যেন একটু সাবধানে অগ্রসর হই, সিংহাসনের পেছনে যাঁরা রয়েছেন অন্ততঃ তাঁদের পা যেন না মাড়াই। কিন্তু ডাঃ দাসের একগুঁয়েমি দেখে তাঁরাও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাইরে থেকে লোকে যাই মনে করুক না কেন, দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। অসাধুতার অকাট্য প্রমাণ পেলেও প্রত্যক্ষভাবে তিনি কিছুই করতে পারেন না, বড়জোর লিখ্‌তে পারেন তাঁর রিপোর্ট এবং যথাস্থানে পাঠাতে পারেন তাঁর মতামত ও সুপারিশ (recommendation)। Action নিতে পারেন

একমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীপর্ষদ। এঁরা যদি action না নেন্ অথবা রিপোর্ট ধামাচাপা দেন, দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব অসহায় নিস্ফল রোষে ফুল্‌তে পারেন মাত্র।...তবু বাংলা দেশের জনসাধারণের মতে, আমি একবছরে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছিলাম তার ঢেউ অনেকদিন পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বল্‌তে চাই। এই দপ্তরে যেটুকু সাফল্য আমি অর্জন কর্‌তে পেরেছিলাম তা' কিছুতেই সম্ভব হ'তনা যদি আমি আমার বিভাগীয় অফিসারদের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা না পেতাম। তাঁরা যে নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে এই কর্তব্যসাধনের জন্য তাঁদের কয়েকজনকেও অনেক অসুবিধায় পড়্‌তে হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের বছরে একটা নতুন অভ্যাস আমি অর্জন করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ডায়েরী লেখা। এর আগে বা পরে আমি কখনও নিয়মিতভাবে ডায়েরী লিখিনি', কিন্তু এই বছরটার অভিজ্ঞতা আমি ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে, যে সব চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন আমি হয়েছি কিছুদিন পরে হয়ত ভুলে যাব, তাই তার স্মৃতি আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেছি ডায়েরীর পাতায়। এই ডায়েরীটি অত্যন্ত মূল্যবান্, কারণ এর মধ্যে এমন সব তথ্য আছে যা' সরকারের কাছে পাঠানো আমার রিপোর্টেও নেই। পাছে হারিয়ে ফেলি বা চুরি যায় এই ভয়ে ডায়েরীটি সীল্ মোহর ক'রে সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার ব্যাঙ্ক্‌এর হেফাজতে। "এক অধ্যায়" এর উপসংহার যদি কখনও লিখি, এই ডায়েরীটি খুবই কাজে লাগ্‌বে।

এমন অহমিকা আমার নেই যে আমি যা দেখেছি বা জেনেছি তা'ই একমাত্র সত্য। যাঁরা অভিযুক্ত, স্বপক্ষে তাঁদের ও অনেক কিছু বল্‌বার আছে বৈ কি! তবে এটুকু আমি জোরগলায়

বল্‌তে পারি যে প্রত্যেকটি বড় কেস আমি নিজে নাড়াচাড়া করেছি এবং খুবই চেষ্টা করেছি objective এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে। আগেই বলেছি, অনেকক্ষেত্রে আমি clearance certificateও দিয়েছি। যাঁরা আমাকে ছিদ্রান্বেষী বা inquisitorial এই প্রকার আখ্যা দিয়েছেন তাঁদের অবগতির জন্য আমার এই statement পুনরুচ্চারণ করলাম।

অবশ্য এটা আমি অস্বীকার করিনা যে এই দপ্তরের কাজে আমি অননুভূতপূর্ব তৎপরতা এবং উৎসাহ দেখিয়েছিলাম। সেটা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই অপরাধী।

এই প্রসঙ্গে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারছিনা। একটা বড় কেস্ তদন্ত কর্‌বার সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কতকগুলো ব্যভিচারের খবর আমার নজরে এসেছিল এবং সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে আলাদা একটা নোট্ও পাঠিয়েছিলাম। রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ কোন ব্যাপারই গোপন থাকে না, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীটিও কেমন ক'রে জান্‌তে পেরেছিলেন আমার এই নোট্ এর কথা। তিনি তুমুল হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি করেছিলেন এবং দাবী জানিয়েছিলেন যে আমার এই নোট্ প্রত্যাহার করতে আমাকে বাধ্য করা হোক্। আমি অবশ্য একটা show-down এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যতদিন পর্য্যন্ত আমি দপ্তরের সচিব ছিলাম ততদিন এসম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করা হয়নি'। বম্বে চলে আস্‌বার পর শুন্‌লাম কর্তৃপক্ষ আরও অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে আমার নোট্‌এ যেসব ঘটনার উল্লেখ ছিল তার কোন conclusive প্রমাণ তাঁরা পান্‌নি, অর্থাৎ আমার নোট্‌টা ভিত্তিহীন!

ব্যাপারটার উপসংহার তখনই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীটি বম্বের ঠিকানায় আমাকে হঠাৎ একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিটা এইরূপ:

"প্রিয় ডাঃ দাস,

আপনি একজন কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লেখক ব'লে গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার কল্পনাশক্তি অত্যন্ত নীচুস্তরের। যে কল্পনার জাল বুনে আপনি এবং আপনার দপ্তরের কয়েকজন অফিসার আমার সম্বন্ধে নোট্ পাঠিয়েছিলেন সত্যের প্রখর আঘাতে তা' ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আপনার একটু লজ্জাবোধ হচ্ছে কি?"

আমি জবাব দিলাম:

"প্রীতিভাজনেষু,

আমি একজন কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লেখক এজাতীয় গর্ব কখনও প্রকাশ করেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যে নোট্‌এর উল্লেখ আপনি করেছেন তাতে কল্পনার চেয়ে রূঢ় প্রমাণসিদ্ধ কথাই ছিল বেশী। লিখেছেন, সত্যের প্রখর আঘাতে তা' ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রশ্ন করছি, কি জাতীয় সত্য? কর্তৃপক্ষ একবারও আমাকে ডেকেছিলেন কি? নোট্‌এর স্বপক্ষে আমারও কিছু বল্‌বার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি? আমি হয়ত নির্লজ্জ, কিন্তু আপনাদের যদি সাহস থাকে তা'হলে আমার নোট্ এবং পরবর্ত্তী চূণকামকরা "সত্য" উভয়ই প্রকাশ ক'রে দিন্‌না!"

এই চিঠির কোন জবাব পাইনি, আশাও করিনি'। আমার ডায়েরীর সঙ্গে এই চিঠিগুলো এবং আরও কয়েকটি মূল্যবান্ কাগজপত্র ব্যাঙ্কএর হেফাজতে রেখে দিয়েছি।

পঁয়ত্রিশ

জীবনের এই অধ্যায়ের উপসংহারে আর একটা বিষয়ের অবতারণা না ক'রে পারছিনা। পলিটিক্যাল পার্টি পোষণ করতে

গিয়ে যে সব দুর্নীতির সূত্রপাত হয় সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বল্‌ব।

সবাই জানেন যে অনেক কোম্পানী, শিল্পপতি ও কণ্ট্রাক্টর বিশেষ বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টির ফাণ্ডে এককালীন বা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। যাতে এরকম চাঁদা দেওয়াটা কোর্টে বে-আইনী বলে সাব্যস্ত করা না হয় সেজন্য Indian Companies Actকে সংশোধন করাও হয়েছে। এই সংশোধন প্রস্তাব যখন লোকসভায় উথাপিত হয় তখন অনেকে প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন যে জাতীয় জীবনে এই ব্যবস্থার repercussions কল্যাণকর হবেনা। কিন্তু দেশের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন্‌নি। পরে কল্‌কাতা হাইকোর্টের একটা কেস্‌এ একজন বিচারপতি এসম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্যও করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন যে, যে আচরণ morally indefensible তাকে আইনের সাহায্যে আইনসম্মত করা উচিত হয়নি'।

দুর্নীতিদমন বিভাগে কাজ করার সময় অনেক কোম্পানী, শিল্পপতি ও কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা কর্‌বার সুযোগ আমার হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই আমি লক্ষ্য করেছি যে তদন্ত ক'রে এঁদের বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট্‌ দাখিল করা সত্ত্বেও শেষপর্য্যন্ত যথোপযুক্ত action নেওয়া হয়নি'। পরে খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পেরেছি যে এঁদের অনেকেই হয় কোন রিলিফ ফাণ্ডে নতুবা কোন পার্টি ফাণ্ডে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে থাকেন। এই চাঁদা দেওয়ার জন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়নি' এটা নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করা হয়ত সম্ভবপর নয়, কিন্তু বাংলাদেশের জন-সাধারণ যদি এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছয় তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি ?

মনে পড়ে, অত্যন্ত বে-আইনী কতকগুলো কাজ করার অপরাধে আমারই নির্দ্দেশে কয়েকজন বিত্তশালী ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছিল। আমার অধস্তন কর্ম্মচারীরা প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলেন, বলেছিলেন, ডাঃ দাস, এঁদের গ্রেপ্তার করা উচিত হবে কি? …আমি বলেছিলাম, আইন যখন বলে যে এজাতীয় অপরাধ কর্‌লে এঁদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, আপনারা নির্ভয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য করে যাবেন।

গ্রেপ্তারটা করা হয়েছিল এক সন্ধ্যায়, যখন আদালত বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার ফলে অভিযুক্তদের অন্ততঃ সেই রাতটা কাটাতে হবে পুলিশের অতিথিশালায়। Non-bailable offence, কাজেই আমার নির্দ্দেশে পুলিশ ও জামিন দিতে রাজী হয়নি'। …সেই রাতে চারদিক থেকে আমার বাড়ীতে সে কি টেলিফোন! …"এ কি করেছেন, ডাঃ দাস? আপনার কর্ম্মচারীরা এঁদের মত গণ্যমান্য লোককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে?" "নৃসিংহবাবু এই সেদিন আপনাদেরই বন্যাতাড়ন ফাণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি জানেন না বুঝি?" "মিঃ কাপূরের কোম্পানী প্রতি বছর পার্টিফাণ্ডে বিশ/পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, তার পুরস্কার কি এই?"

বলা বাহুল্য, আমার নির্দ্দেশ আমি প্রত্যাহার করিনি' এবং একটা রাত তাঁদের কাটাতে হয়েছিল পুলিশের হেফাজতে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পরের দিন আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন এবং চার্জ্জসিট দাখিল করার পরেও নানা সরকারী আধা সরকারী সভাসমিতিতে তাঁরা আনাগোনা করেছিলেন, সম্মানিত অতিথির পোষাকে। এই সব দেখে সাক্ষীরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং discretion is the better part of valour এই নীতি অনুসরণ ক'রে তারা প্রকাশ্য আদালতে সত্য কথা বল্‌তে সাহস করেনি'।

আমার ধৃষ্টতা এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার এঁরা ক্ষমা কর্‌তে পারেন্‌নি'। নানাভাবে আমাকে অপদস্থ এবং ব্যতিব্যস্ত করে

তুল্‌তে এঁরা চেষ্টা করেছিলেন এবং আজও কর্‌ছেন। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনবার প্রয়াসও এঁরা করেছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত এগোননি', কারণ তাঁরা জান্‌তেন (এবং এখনও জানেন) যে তাঁদের expose কর্‌বার মত মালমশলা ব্যাঙ্কের হেফাজতে আমি রেখে দিয়েছি।

দুঃখ হয় শুধু এই ভেবে যে, পার্টির স্বার্থ নিয়ে দেশের অধিনায়কেরা এতই আবিষ্ট (obsessed) হয়ে রয়েছেন যে এই পলিসির এবং এর ব্যাপক পরিণামের (long-term consequences) কথা একেবারেই ভাব্‌ছেন না।

ছত্রিশ

আই-সি-এস্ থেকে আমি বেরিয়ে আসি ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে, কিন্তু দুর্নীতিদমন দপ্তর থেকে বিদায় নেই ঐ বছরের ৩০শে নভেম্বর। পূরো ডিসেম্বর মাসটা আমি ছুটিতে ছিলাম।

আই-সি-এস্ থেকে অবসর গ্রহণ কর্‌বার সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম ঐ বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে, কিন্তু আমার formal দরখাস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম ২৯শে জুলাই তারিখে। সরকারের অনুমোদন আমার কাছে পৌঁছয় তার ঠিক একমাস পরে—২৮শে আগষ্ট তারিখে। বোধ হয় তার পরের দিনই খবরটা বাংলাদেশের নানা কাগজে ছড়িয়ে পড়ে।

সে কি হৈ-চৈ! খবরের কাগজে কি জল্পনাকল্পনা! সরকারী জীবনের সবচেয়ে বড় আসনগুলো পাবার প্রাক্কালে ডাঃ দাস কেন পদত্যাগ কর্‌ছেন? দুর্নীতিসংক্রান্ত একটা বিশেষ কেস্ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধই কি এর কারণ? শুধু বন্ধু-বান্ধবেরা নয়, পরিচিত অপরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে, ঐ এক প্রশ্ন: আপনি কেন চলে যাচ্ছেন, ডাঃ দাস?

সরকারী আইনকানুনের কঠিন নিগড়ে আমি তখন আবদ্ধ, কাজেই এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিনি'। আজ খুলে বল্ছি।

প্রথমেই বল্ছি যে, দুর্নীতিসংক্রান্ত কোন বিশেষ কেস্ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য আমি পদত্যাগ করিনি'। আর এ গুজবও সত্যি নয় যে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে পদত্যাগ কর্তে বাধ্য করেছিলেন।...পদত্যাগ আমি করেছি আমার স্বাধীন ইচ্ছায়।

পক্ষান্তরে এটাও সত্যি যে দুর্নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে এবং আরও অনেক ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার গভীর মতবিরোধ চলছিল। আমি ক্রমশই দেখ্ছিলাম, আমার চিন্তাধারা, আমার কর্ম্মপদ্ধতি কর্ত্তৃপক্ষের পছন্দ হচ্ছে না। হয়ত দোষটা আমারই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পাওয়াটা চরিত্রের একটা খুঁত বই কি!

সে যাই হোক্, ধীরে ধীরে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল যাতে কর্ত্তৃপক্ষের এবং আমার মধ্যে একটা সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী লিখবার সময় এখনও আসেনি'। তবে আপাততঃ এটুকু বল্তে পারি যে ১৯৫৮ সালের মে বা জুলাই মাসে নাহ'লেও তার বছরখানেক বছরদুয়েকের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই পদত্যাগ কর্তাম।

এখানে একটা অদ্ভুত coincidence কথা না বলে পারছিনা। ঠিক ঐ সময়টায় "মাসিক বসুমতী"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল আমার লেখা উপন্যাস "অভিযাত্রী", যা' পরে বই-আকারে প্রকাশ করেছেন ডি, এম্, লাইব্রেরী। ১৯৪২-৫১ সালের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসের নায়ক প্রদীপ, কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের একজন সত্যাগ্রহী, স্বাধীন ভারতে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তার নজরে আসে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নানা দুর্নীতি এবং

গলদ, সে দেখতে পায় যে যাঁরা এককালে ছিলেন একনিষ্ঠ দেশ সেবক, ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছেন স্বার্থান্বেষী, কুটিল এবং অসত্যাশ্রয়ী। আর দেখতে পায় যে আই-সি-এস্‌এর বর্ম্ম পরিহিত বড় বড় কর্ম্মচারীরাও নিঃসঙ্কোচে কর্‌ছেন তাঁদের স্তুতি। অবশেষে প্রদীপের সঙ্গে তার উপরওয়ালার লাগে সংঘর্ষ এবং সরকারী চাকুরীশালা থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়।

প্রদীপের কাহিনী পড়ে অনেকেই তখন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ডাঃ দাস, আপনিই কি আপনার উপন্যাসের নায়ক প্রদীপ? এই উপন্যাসের আবরণে আপনার পদত্যাগের কাহিনীই কি আপনি বল্‌তে চেয়েছেন?

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, না।

কথাটা মিথ্যা নয়। "অভিযাত্রী" উপন্যাসটি আমি লিখেছিলাম ১৯৫৬ সালের জুন-জুলাই-আগষ্ট মাসে। তারপর বহুদিন ওটা ফেলে রেখেছিলাম। ১৯৫৭ সালের শেষভাগে কি একটা কাজ উপলক্ষে "মাসিক বসুমতী"র সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক আমার কাছে আসেন। কথায় কথায় আমার লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির বিষয় উল্লেখ করি। ঘটকমশায় তাঁর পত্রিকায় আমার ঐ উপন্যাসটি সমর্পণ কর্‌তে অনুরোধ করেন, এবং আমি রাজী হই। যতদূর মনে পড়ে, বাংলা ১৩৬৪ সালের শেষাশেষি অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৫৮ সালের প্রথমভাগে "অভিযাত্রী" ধারাবাহিকভাবে "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত হ'তে সুরু করে। কাজেই এই উপন্যাসের আবরণে আমার পদত্যাগের কাহিনী আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম, একথা সত্যি নয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যা নিহিত ছিল তার ছায়া নিশ্চয়ই এই লেখার ওপরে পড়েছিল। কোন phychic sixth sense আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কি না সেটা psycho-analyst এবং psychiatristরা বিচার করে দেখ্‌বেন। আমি নিজেও অবাক্

হয়ে যাই যখন ভাবি, পদত্যাগ কর্‌বার সিদ্ধান্ত নেবার পূরো দু'বছর আগে কি ক'রে প্রদীপের ছবি আমি এঁকেছিলাম!

"অভিযাত্রী" রচনার সঠিক তারিখ থেকে নিশ্চিতভাবে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছেঃ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে-নিতে না পারার দুর্ভাগ্য (?) সুরু হয়েছিল দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার নেবার অনেক আগে থেকেই। সে সব কাহিনী বল্‌ব আরও কিছুদিন বাদে, পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে।

আমার এই অধ্যায়ের সমাপ্তি হল ১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে। আমার পরবর্ত্তী সচিবের কাছে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে যখন বিদায় গ্রহণ কর্‌লাম তখন মুখে হাসি টেনে নিয়ে এলেও মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে আবেগময় মুহূর্ত্ত এসেছিল এর দিন তিনেক পরে, যখন মহারাষ্ট্র-নিবাসের হল্‌ ঘরে দুর্নীতিদমন বিভাগের ছোটবড় সমস্ত অফিসার মিলিত হয়ে তাঁদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে উপহার দিলেন একখানা রূপোর salver—তাঁদের প্রত্যেকের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। এই উপহারটি আমাকে সর্ব্বদা মনে করিয়ে দেয় সেই একটি বছরের কথা—যে বছরটিকে একহিসেবে আমি বল্‌তে পারি আমার সরকারী চাকুরী জীবনের চরম উৎকর্ষ (climax)।

এই অধ্যায়ের অনলস প্রতিধ্বনি আমি আজও শুন্‌তে পাই প্রত্যূষের স্বল্পাভ অস্বচ্ছতায়, রৌদ্রময় মধ্যাহ্নের নিঃসঙ্গ প্রহরে, রাত্রির উৎসবমুখর কোলাহলের মধ্যে। প্রতিধ্বনির রূপ আমার কাহিনীর মাধ্যমে কতখানি ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছি তা' বিচার কর্‌বার ভার বাংলাদেশের বন্ধুদের হাতে তুলে দিলাম। শুধু আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের, যাঁদের আনুকূল্যে বা যাঁদের উপলক্ষ্য ক'রে নিতান্ত ক্ষুদ্র, অথচ আমার কাছে প্রগাঢ়, এই ভূমিকায় আমি অংশগ্রহণ কর্‌তে পেরেছিলাম।

নমস্কার!

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

[১৩৬৫ সালের পৌষ সংখ্যা "মাসিক বসুমতী"তে "চারজন" এই শীর্ষকে ডাঃ নবগোপাল দাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পরিচিতি "এক অধ্যায়" বুঝতে সাহায্য করবে ব'লে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। —প্রকাশক]

আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, চিন্তাকে কাজে পরিণত করার সাহস, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সহজে স্বার্থত্যাগ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা মানবজীবনে ঈপ্সিত সম্পদ। আনন্দের কথা, প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ও সুলেখক ডাঃ নবগোপাল দাস এই সমস্ত গুণের অধিকারী।

১৯১০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ডাঃ দাসের জন্ম হয়। আদিনিবাস ঢাকাতেই, মাতুলালয়ও। পারসিক উর্দুভাষায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মুন্সী হরিমোহন দাস নবগোপালের পিতামহ। বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ পরলোকগত দুর্গামোহন দাস নবগোপালের পিতৃদেব। মায়ের নাম শ্রদ্ধেয়া গিরিবালা দেবী। ঢাকাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির গরিমায় গরীয়সী ক'রে তোলার ক্ষেত্রে এই পরিবারের অবদান অতুলনীয়।

ডাঃ নবগোপাল দাসের ছাত্রজীবন সাফল্যের আলোয় উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ ক'রে বংশের রূপ করেছেন উজ্জ্বল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি করেছেন গর্ব, শুভার্থীদের অন্তরে জাগিয়েছেন অবর্ণনীয় আনন্দ। ঢাকা জুবিলী স্কুল থেকে ডাঃ দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম (১৯২৬), কল্‌কাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম (১৯২৮), বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান

(১৯৩০) অধিকার কর্‌তে সক্ষম হন। এরপর ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৯৩১ সালে আই-সি-এস্ পরীক্ষায় লিখিত বিষয়গুলিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা (viva voce) আশানুরূপ না হওয়ায় মেধানুসারে যুক্ততালিকায় ষষ্ঠস্থান, কিন্তু ভারতীয় তালিকায় প্রথমস্থান, অধিকার করেন।

ভারতে ফিরে এলেন নবগোপাল। স্থুরু হ'ল কর্ম্মজীবন, যার পর থেকে আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পেরিয়ে এলেন যথেষ্ট সম্মান, খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সঙ্গে। ভারতবর্ষে এসে প্রথমে রাজসাহীতে ও পরে বারাসতে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তারপর প্রাদেশিক সরকারের অর্থবিভাগে কিছুকাল থাকার পর পটুয়াখালি মহকুমার ভার গ্রহণ করেন। কর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় ব্যাপক অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি'। ১৯৩৬ সালে ঐ বিষয়ক তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "Banking and Industrial Finance in India" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিপুল সমাদর লাভ করে। পরে এই গ্রন্থটির জন্য তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত Griffith Memorial Prize পান্। এর কিছুকাল পূর্বে তিনি বীরেশ্বর মিত্র স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অর্থনীতি সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অধ্যয়নের জন্য ছুটি নিয়ে তিনি পুনর্বার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ও লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্‌এ যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে সেখান থেকে Industrial Enterprise in India এই থিসিস্ লিখে পি, এইচ, ডি (ইকন্) উপাধি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তাঁর Industrial Planning : Why and How নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

দেশে ফিরে এসে তিনি বিষ্ণুপুরে কর্মে নিযুক্ত হন্। কিছু-কালের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে কলকাতায় চলে আসেন। এর অল্পদিন পরেই নয়াদিল্লীতে

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এগ্রিকালচার মার্কেটিং য়্যাডভাইসাররূপে যোগ দেন। অবিভক্ত বাংলার জনসংভরণ বিভাগের উপ-অধিকর্তা (১৯৪৩-৪৫), নিয়োগ ও পুনর্বাসনের আঞ্চলিক পরিচালক (১৯৪৫-৪৭), কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পুনর্বাসনের প্রধান পরিচালক (১৯৫৭-৫২), প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব (১৯৫২--৫৬), প্রভৃতি প্রভূত দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ ডাঃ দাস দ্বারা অলঙ্কৃত। পরে একবছর তাঁকে সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি বিভাগেরও ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। সর্বশেষে এন্‌ফোরস্‌মেণ্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার ও সচিবের আসনে এঁকে সমাসীন দেখা গেছে। এখানে থাকা কালীন দুর্নীতি নিরোধে যে সকল ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেছেন এবং দুর্নীতি নিয়োগকল্পে যে শক্তি, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা' সংবাদপত্র সমূহ ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দনে বিভূষিত হয়। গত ডিসেম্বর মাসে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে ১লা জানুয়ারী (১৯৫৯) থেকে বোম্বাইতে Employers, Federation of Indiaর প্রধান পরিচালকের কর্মভার গ্রহণ করেছেন।

বাংলার সাহিত্য জগতেও নবগোপাল দাস মহাশয়ের আসন অটল। দীর্ঘদিন অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও সেবার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইনি শ্রীবৃদ্ধি ক'রে আস্‌ছেন। বর্ত্তমানে কিছুকাল যাবৎ মাসিক বসুমতীতেই তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, মাসিক বসুমতী যাঁরা ভালবাসেন ও নিয়মিত পাঠ করেন, তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে নতুন ক'রে আর বলার কিছু নেই। বংশের মহান্ ঐতিহ্যই তাঁকে সাহিত্যসাধনার অফুরন্ত প্রেরণা জুগিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি দেখা গেছে নবগোপালের অবর্ণনীয় অনুরাগ। নবগোপালের প্রথম উপন্যাস "সাগর দোলায় ঢেউ" ও প্রথম ছোট গল্পের বই "অসমাপ্ত"। তাঁর অন্যান্য বই এর মধ্যে "অনবগুণ্ঠিতা", "নিঃসহ যৌবন" এবং "তারা দু'জন"এর

নাম করা যেতে পারে। এছাড়াও বাংলার বহুবিখ্যাত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৪ সালে ঢাকা জেলার ডাঃ নগেন্দ্রমোহন গুপ্তের ছোট মেয়ে শ্রীমতী উমাদেবীর সঙ্গে নবগোপালের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। সংস্কৃতির দরবারে শ্রীমতী উমা দেবীও অপরিচিতা নন্। বাংলা দেশের স্বনামধন্যা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী উমাদেবীও একজন। উমা দেবীও কয়েকবার ভারতের বাইরে গেছেন—ভ্রমণোদ্দেশে এবং চিত্রশিল্পে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্র ঘোষের সহধর্মিনী অধ্যাপিকা ডাঃ শ্রীমতী সতী ঘোষ উমাদেবীর দিদি।

ডাঃ দাসের কর্মদক্ষতা সর্বত্র লাভ করেছে যথাযোগ্য সমাদর। তাছাড়া বিশেষত্ব এই যে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধুর আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার তাঁর সহকর্মীদের এবং অধস্তন কর্মীদের অন্তর অভিভূত করেছে। এইখানেই বোঝা যায় যে কর্মক্ষেত্রে ডাঃ নবগোপাল দাস কতখানি জনপ্রিয়।